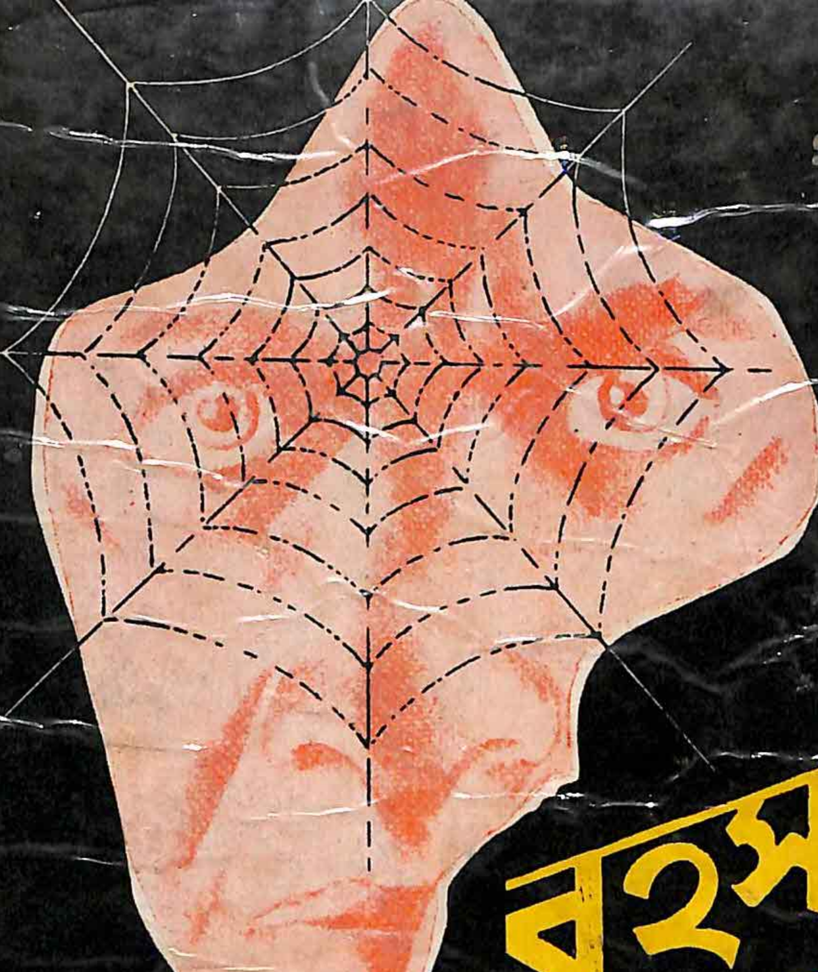


রহস্যভেদী মেঘনাদ

স্বপন বন্দ্যোপাধ্যায়

রহস্যভেদী মেঘনাদ

দুঃসাহসী গোয়েন্দা অ্যাডভেঞ্চার

রহস্যভেদী মেঘনাদ

স্বপন বন্দ্যোপাধ্যায়

রে অ্যাণ্ড অ্যাসোসিয়েট্‌স্ (পাবলিশিং)
২ গুরুপ্রসাদ চৌধুরী লেন
কলকাতা—৭০০০০৬

প্রথম প্রকাশ ঃ
সেপ্টেম্বর ১৯৮৬

প্রকাশক ঃ
পি. রায়
রে অ্যান্ড অ্যাসোসিয়েট্‌স্‌ (পাবলিশিং)
২ গুরুপ্রসাদ চৌধুরী লেন
কলকাতা—৭০০০০৬

প্রচ্ছদ ও অলংকরণ ঃ
স্বপন রায় চৌধুরী

মুদ্রক ঃ
নিতাই সামন্ত
পুষ্প প্রিন্টার্স
১৫ অনাথ দেব লেন
কলকাতা-৭০০০০৬

মুখ্য পরিবেশক ঃ
ইন্ডিয়ান প্রোগ্রেসিভ পাবলিশিং কোং প্রাঃ লিমিটেড
৫৭ সি কলেজ স্ট্রীট
কলকাতা-৭০০০৭৩

মূল্য ঃ বারো টাকা

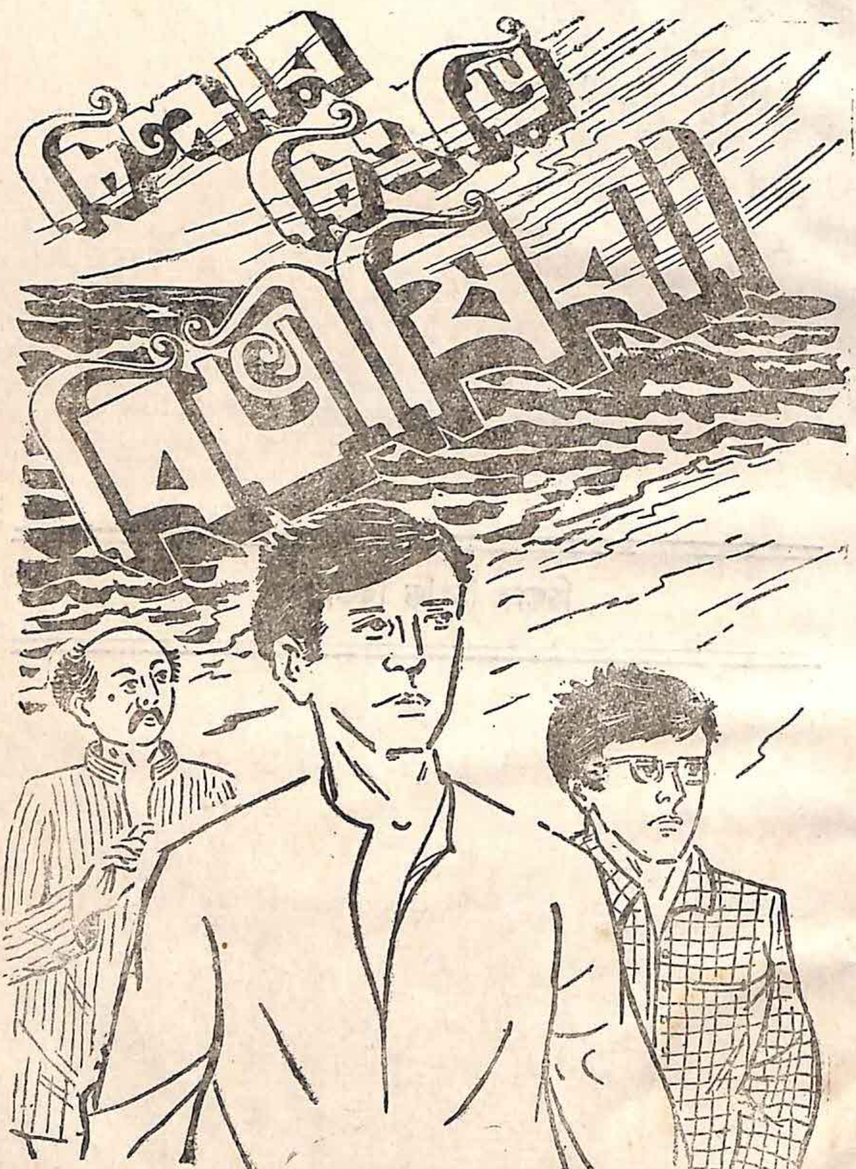
সূচীপত্র

চিল্কার চিংড়ি বিভীষিকা—৯
রায় ভিলা রহস্য—৫৭
শ্রীশ্রীবোলতা বাবা—১০৩

পরম স্নেহাস্পদ,

অরিন্দম, সুমিত্রা ও সুব্রতাকে

চিল্কার চিংড়ি বিভীষিকা



এক

[খাওয়ার টেবিলে নাটক]

হোটেলের ডাইনিং রুমে খেতে বসেছিলাম মেঘনাদ আর আমি মুখোমুখি।

হোটেলের বয় এসে প্লেট সাজিয়ে দিয়ে গেল—ফাইন বাসমতী চালের ভাত, আলু পটলের তরকারী, পোনামাছের ঝোল, পাঁপর আর কাঁচা আমের চাটনি।

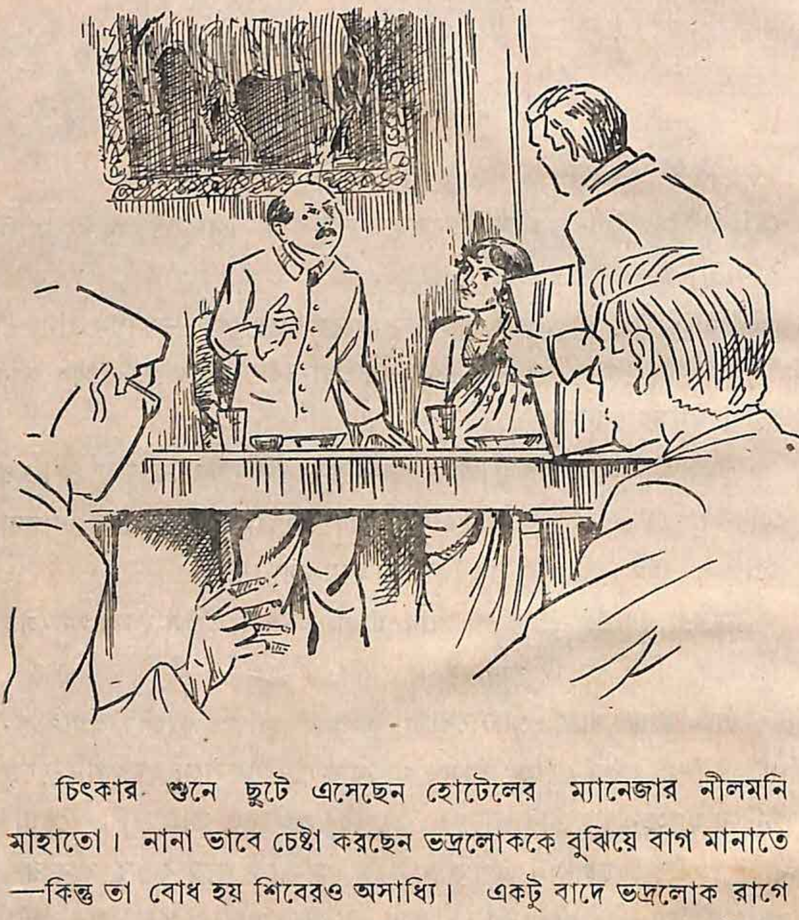
সবে এক গ্রাস মুখে তুলেছি কি তুলিনি ডাইনিং রুমের কোনের টেবিলটা থেকে ভেসে এল এক প্রচণ্ড হুঙ্কার,—চিংড়ি কই, বাগদা চিংড়ি ? এই নিয়ে পর পর তিনদিন হয়ে গেল।

ঘরের বিভিন্ন টেবিলে আর যারা খেতে বসেছিল তারা সকলেই একসঙ্গে চমকে তাকাল সেদিকে।

এক টাক মাথা মোটাসোটা বছর পঁয়তাল্লিশ বয়সের ভদ্রলোক, নাকের নিচে পুরুষ্ট গোঁফ, তখনও খাওয়ার টেবিলে বসে হাত পা ছুঁড়ে চেঁচিয়ে যাচ্ছেন। তাঁর পাশের চেয়ারে সম্ভবতঃ তাঁর স্ত্রী। ছোট্ট-খাট্ট নিরীহ চেহারা। অস্ফুট কণ্ঠে স্বামীকে শান্ত করার অনবরত বৃথাই চেষ্টা করে চলেছেন। আর টেবিলের সামনে হোটেলের বয়টা দাঁড়িয়ে কাঁপছে বলির পাঁঠার মত।

—আপনারা ভেবেছেন কি ? স্ত্রীর কথায় বিন্দুমাত্র কর্ণপাত না করেই ভদ্রলোক চিৎকার করে বলেন : কাঁড়ি কাঁড়ি টাকা হোটেল চার্জ নেবেন অথচ খদ্দেরের ইচ্ছেমতো একটা কিছু রাঁধবেন না ?

আমি আজই কলকাতায় ফিরে গিয়ে আপনাদের নামে বদনাম ছড়াতে শুরু করবো—খবরের কাগজ, রেডিও—দরকার হলে টি. ভি. প্রোগ্রামের মারফৎ…!



চিৎকার শুনে ছুটে এসেছেন হোটেলের ম্যানেজার নীলমনি মাহাতো। নানা ভাবে চেষ্টা করছেন ভদ্রলোককে বুঝিয়ে বাগ মানাতে—কিন্তু তা বোধ হয় শিবেরও অসাধ্যি। একটু বাদে ভদ্রলোক রাগে গর গর করতে করতে উঠে বেরিয়ে গেলেন ডাইনিং হলের বাইরে। তাঁর স্ত্রীটিও খাওয়া ফেলে পেছনে পেছনে ছুটলেন সম্ভবতঃ স্বামীর মেজাজ শান্ত করার প্রচেষ্টায়।

ভদ্রলোকের রাগের কারণ নাকি বাগদা চিংড়ি।

এই হোটেলে এসে গত তিনদিন বহু অনুরোধ, এমন কি ডবল

চার্জ দিতে চাওয়া সত্ত্বেও ভদ্রলোকের পাতে বাগদা চিংড়ির মালাই-কারী দেওয়া যায় নি।

কারণটা শুনে হল শুদ্ধ বোর্ডার হো হো করে হেসে উঠলেও মেঘনাদ কিন্তু হাসলো না।

সে উল্টে বললো—বোর্ডারের যখন এতই ইচ্ছে, তখন বাগদা চিংড়ি রাঁধতে আপনাদের অনিচ্ছার কারণটাই বা কি?

হোটেল ম্যানেজার নীলমনি মাহাতো বললেন—মশাই, সম্ভব হলে কি বোর্ডারের এই সামান্য ইচ্ছেটা মেটাতাম না! কিন্তু সারা পুরী বাজারে গত কয়েকদিন যাবৎ একটাও বাগদা চিংড়ির আমদানী নেই।

বাগদা চিংড়ির আমদানী নেই।—মেঘনাদ অবাক হল। এমন তো হবার কথা নয়। এখানে চিংড়ির চালান আসে পুরীর কাছাকাছি চিল্কা হ্রদ থেকে।

—জানেন ঠিকই, নীলমনি মাহাতো বললেন—কিন্তু গত কয়েক-দিন যাবৎ চিল্কা হ্রদে কি সব ঘটনা ঘটায় ওখানে জেলেরা নাকি জলে নামছে না।

মেঘনাদ শুনে কিছুক্ষণ চুপচাপ হাত গুটিয়ে বসে কি যেন ভাবলো। তারপর খাওয়া শুরু করে আমায় চুপিচুপি বললো—অর্ণব, চটপট খেয়ে নে। ব্যাপারটা একটু দেখা দরকার।

বুঝলাম মেঘনাদের মাথার পোকা নড়েছে।

দুই

[গৌরচন্দ্রিকা]

পাক্ষিক 'তাজা খবর'-এর মালিক হরিসাধনবাবু নিজেই কদিন আগে মেঘনাদকে ডেকে বলেছেন—ওহে সাংবাদিক, তুমি এ সময় ইচ্ছে করলে কয়েকটা দিন ছুটি নিয়ে কোথাও গিয়ে ঘুরে আসতে পার।

হরিসাধনবাবু বুদ্ধিমান, বিষয়ী লোক। মেঘনাদ যে ইদানীং কাজের চাপে ভেতরে ভেতরে বেশ ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল তা উনি লক্ষ্য করেছেন—আর সে কারণেই ওঁর এই বদান্যতা। যাতে হাওয়া বদল করে এসে মেঘনাদ আরও তাজা মেজাজে তাজা খবরের সাংবাদিকতার ঝামেলা পোয়াতে পারে।

ছুটি পেয়েই মেঘনাদ আমায় ফোন করেছে—অর্ণব, পুরী যাবি ?

আমার মনটা তখন অফিসের জাবদা খাতার হিসেবের পাতায় ছিল, তাই প্রথমটা ঘাবড়ে গিয়ে বলেছিলাম, যমপুরী না স্বর্গপুরী !

মেঘনাদ হেসে বলেছিল—পুণ্যলোভীরা অবশ্য জায়গাটাকে স্বর্গপুরীই বলে থাকে। শ্রীক্ষেত্রে নাকি স্বয়ং ভগবানের বাস।

আমি বলেছিলাম—কিন্তু বাপু তুমি তো পুণ্যের ঘড়া ভরার ছেলে নও। আসল উদ্দেশ্যটা কি ?

—বিশুদ্ধ বায়ু সেবন। কদিন সমুদ্রের ধারে থেকে প্রাণ মন 'ওজোন' ভরে নিয়ে আসবো।

এবার আমি কৌতুক চেপে বলেছি—'ওজন' কিলো না লিটার হিসেবে ?

—তোর সঙ্গে কথা বলাই আজকাল ঝামেলা। এ হল—

'OZONE', আণবিক সংকেত O_3, সোজা কথায় অক্সিজেনেরই এক প্রতিরূপ। শরীর স্বাস্থ্যের পক্ষে ভীষণ উপকারী। সমুদ্রের ধারে বিশুদ্ধ প্রকৃতির মধ্যেই একমাত্র এর কিছুটা সন্ধান মেলে।

আমি হেসে উঠতেই মেঘনাদ আমার কৌতুক টের পায়। প্রসঙ্গ বদলে বলে, আজই টিকিট কেটে ফেলছি বুঝলি?

এরপর আর কি বলার থাকতে পারে আমার। মনে মনে বললাম ভালই হল, কদিন সমুদ্রের ধারে বসে শুধু ঢেউ গুনে কাটান যাবে।

কিন্তু ঢেঁকি স্বর্গে গেলেও ধান ভাঙে—এই আপ্ত বাক্যটা যদি তখন মনে রাখতাম!

সে কথা যথাসময়ে।

জগন্নাথ এক্সপ্রেসের যাত্রী হয়ে আমরা পুরী এসেছি গতকাল বিকেলে।

এসে উঠেছি এখানকার এই বিখ্যাত হোটেলটিতে। আজ দুপুরে খাওয়ার টেবিলে বসার সময় পর্যন্ত এখানে উল্লেখযোগ্য কিছু চোখে পড়ে নি। তারপর খাওয়ার টেবিলে যা ঘটলো আমার কাছে তা এক বাতিকগ্রস্থ মানুষের নিছক খ্যাপামি ছাড়া অন্য কিছু মনে হয় নি। কিন্তু কেন কে জানে, মেঘনাদ হঠাৎ ব্যাপারটা নিয়ে মাথা ঘামাতে শুরু করেছে।

বিকেলের মধ্যেই পুরীর আশপাশের অনেকগুলো হোটেল, মাছঅলা এবং জেলেদের কাছে মেঘনাদ যা তথ্য সংগ্রহ করলো তা মোটামুটি আমাদের হোটেলের ম্যানেজার নীলমনি মাহাতোর সংবাদেরই অনুরূপ।

পুরীতে বাগদা চিংড়ির আমদানী বর্তমানে বন্ধ। কারণ চিল্কা হ্রদে জেলেরা আর মাছ ধরতে পারছে না। কিছু একটা গণ্ডগোল যে ওখানে হয়েছে তা এক বাক্যে সবাই বললো কিন্তু সঠিক কারণটা কেউই বলতে পারলো না।

তা জানলাম পরদিন সকালে সংবাদপত্রে।

তিন

[দুর্জয়সিংহ চক্রবর্তী]

দুর্জয়সিংহ চক্রবর্তীর সঙ্গে আমাদের আলাপ হল পরদিন সকালে।

দুর্জয়সিংহবাবু হলেন গতকাল ডাইনিং হলের সেই হু-হুঙ্কারী ভদ্রলোক।

আলাপটাও হল হুঙ্কারের মধ্যেই।

ভোরের সমুদ্রে সূর্যোদয় দেখে আমরা তখন হোটেলে ফিরছিলাম।

পুরীর সমুদ্রে সূর্যোদয়ের দৃশ্যটা সত্যিই ভারী সুন্দর। সারা আকাশ আর সমুদ্রে আগুন জ্বেলে কে যেন নতুন দিনের সূর্যটাকে একটা লাল বলের মত ছুঁড়ে দেয় পৃথিবীর আকাশে। এ দৃশ্য দেখার জন্য সমুদ্রের ধারে প্রচুর দর্শক সমাগম হয়।

আমরা সূর্যোদয় দেখে সমুদ্রের ধারে কিছুক্ষণ বেড়িয়ে হোটেলে ফিরছিলাম।

হোটেলের কাছাকাছি আসতেই একটা চেঁচামেচি কানে এল।

আর একটু এগুতেই চোখে পড়লো।

গতকাল হোটেলের ডাইনিংরুমে দেখা সেই ভদ্রলোক। ভদ্রলোকের এক গালে দাড়ি কামানো, অন্য গালের কিছুটা অংশে সবে ক্ষুর চালান হয়েছে বাকি অংশটায় এখনও সাবান মাখান আছে—কিন্তু এই অবস্থাতেই ভদ্রলোক উঠে দাঁড়িয়ে নাপিতের হাত থেকে ক্ষুর, কাঁচি কেড়ে নিয়ে তার দিকে তেড়ে গেছেন।

হলটা কি ?

ব্যাপার মালুম হল সামনে গিয়ে দাঁড়িয়ে একটু শুনতেই।

নাপিত নাকি ওঁর দাড়ি কামাতে গিয়ে পুরুষ্ট গোঁফের কিছুটা অংশ বেশি কেটে ফেলেছে।

—তুম ডাকু হ্যায়, ক্রিমিনাল হ্যায়। হাম তুমকো জেল মেঁ ভরেগা। বলতে বলতে নাপিতকে উনি মারতে যান আর কি।

ইতিমধ্যেই আশপাশে বেশ কয়েক জন দর্শক জমে গেছে। ওরা সবাই মজা দেখছে।

শেষ পর্যন্ত মেঘনাদই পরিস্থিতির সামাল দিল। ভদ্রলোক নিজেই আয়নার সামনে বসে দাড়ি কামানো শেষ করলেন। নাপিত ব্যাচারি বসে রইলো জুল জুল করে তাকিয়ে। এমন খদ্দের এর আগে তার কোনকালে জুটেছে কি না কে জানে!

ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপ হল তারপর।

ব্রেকফাস্ট সেরে ঘর থেকে বেরুচ্ছি, ভদ্রলোকের সঙ্গে বারান্দায় দেখা। নিজেই এগিয়ে এসে ভরাট গলায় কথা বললেন—গতকাল এসেছেন ? নিবাস কলকাতা ?

আমরা অবাক হলাম। এত হৈ চৈ-এর মধ্যেও ভদ্রলোক নজর রেখেছেন তো।

ভদ্রলোক আমাদের মনোভাব আঁচ করেই বোধ হয় বললেন, কিছু কিছু মানুষকে দেখলেই মনে থেকে যায়। ঠিক কি না ?

—তা তো ঠিক। মেঘনাদ বললো—কিন্তু আমরা যে কলকাতা থেকে আসছি বুঝলেন কি করে ?

—এককালে গোয়েন্দা গল্পের পোকা ছিলাম মশাই। লোকের হাঁটা চলা দেখলেই অনেক কিছু বলতে পারি। ভদ্রলোকের কথার ধরনে হাসি পেল। অতি কষ্টে তা চাপলাম। ভদ্রলোক সত্যিই ইন্টারেস্টিং।

হঠাৎ মেঘনাদ বললো—আপনার 'গোঁফ-সমস্যা' মিটেছে ?

ভদ্রলোক বললেন—আপনি না থাকলে ব্যাটাকে মেরেই দিতাম। আরে, গরীব মানুষ, সকালে এসে যখন কামাতে চাইলো, ভাবলাম, আমাকে দিয়েই না হয় আজ ওর দিনের বউনিটা হয়ে যাক—কিন্তু ব্যাটা যে শুধু মাকুন্দ-ছাঁট ছাড়া অন্য কিছু জানে না কি করে জানবো মশাই।

—তা তো ঠিক। কথায় বলে 'গোঁফের আমি গোঁফের তুমি, গোঁফ দিয়ে যায় চেনা'… !

মেঘনাদের কণ্ঠে ছড়াটা শেষ হবার আগেই উনি হৈ হৈ করে হেসে উঠলেন। বললেন,—এক্সিলেণ্ট। আসুন মশাইরা আমার ঘরে, খানিক আলাপ পরিচয় করা যাক।

ভদ্রলোকের ঘরে ঢুকেই আরও পরিচয় হল। ওঁর নাম শ্রীযুক্ত দুর্জয়সিংহ চক্রবর্তী। কলকাতার বড়বাজারে হোলসেল কাপড়ের দোকান আছে।

দুর্জয়সিংহবাবুর স্ত্রী হেমলতা দেবী কিন্তু স্বভাবে স্বামীর সম্পূর্ণ বিপরীত। ছোট্টখাট্ট চেহারা। শান্ত। আমরা যখন ঘরে ঢুকলাম উনি এক কোনে বসে জাঁতিতে কুচ কুচ করে সুপুরি কাটছিলেন।

মেঘনাদ একাধারে সাংবাদিক এবং রহস্যভেদী এ পরিচয় পেয়ে দুর্জয়সিংহবাবুর তো আমাদের প্রতি ঔৎসুক্য আরও বেড়ে গেল।

কিছুক্ষণ আলাপের পরই বুঝলাম দুর্জয়সিংহ চক্রবর্তী মানুষটা মজার। ওপরে হাঁকডাক যতই থাকুক মনটা সাদা।

উনি হাত পা নেড়ে ওঁর পুরী আসার উদ্দেশ্যটা সবিস্তারে বোঝাচ্ছিলেন। উনি এখানে এসেছেন স্রেফ সস্তায় বাগদা চিংড়ি খেতে। ওঁর মতে বাগদা চিংড়ির স্বাদ নাকি রাবড়িকেও হার মানায়।

শুনতে শুনতে অবাক হচ্ছিলাম। লোকে পুরী আসে মন্দির কিংবা সমুদ্রের আকর্ষণে কিন্তু এমন কোন কারণ কারুর আসার পেছনে থাকতে পারে ঠিক যেন বিশ্বাস হচ্ছিল না।

দুর্জয়সিংহবাবু অবশ্য কারুর বিশ্বাস-অবিশ্বাসের ধার ধারেন বলে

মনে হল না।

এক সময় সখেদে বললেন—চিল্কা থেকে চিংড়ি আমদানী বন্ধ। এমন তাজ্জব কথা এখানকার হাজার বছরের ইতিহাসে শুনেছেন মশাই ?

চিল্কার চিংড়ির হাজার বছরের ইতিহাস নিয়ে সত্যিই কেউ গবেষণা করেছে কি না বলতে পারি না, কিন্তু আমি কিছু বলার আগেই সেদিনের খবরের কাগজটা একজন হোটেল বয় এসে দিয়ে গেল।

খবরের কাগজের পাতায় চোখ রেখে কয়েক মুহূর্ত বাদেই হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠলেন দুর্জয়সিংহ—দেখুন দেখুন কী কাণ্ড! আমাদের আলোচনার বিষয়বস্তুই যে আজকের কাগজের হেডলাইন—'চিল্কার চিংড়ি বিভীষিকা' !!

চার

[সংবাদপত্রের আজব খবর]

দুর্জয়সিংহবাবুর ঘর থেকে ফিরে হোটেলে নিজেদের ঘরে বসে সংবাদ-পত্রের খবরটা তন্ন তন্ন করে পড়লাম।

সংবাদে প্রকাশ ঃ

বিশেষ সংবাদদাতা, চিল্কা,—ওড়িশার পুরী ও গঞ্জাম জেলায় বিশাল চিল্কা হ্রদ অবস্থিত। সম্প্রতি সেখানে এক আশ্চর্য দুর্বিপাক দেখা দিয়েছে। ঝাঁকে ঝাঁকে বাগদা চিংড়ির পাল এসে জেলেদের নৌকো আক্রমণ করে ডুবিয়ে দিচ্ছে। ইতিমধ্যে কয়েকজন জেলের প্রাণহানিও ঘটেছে।

সব থেকে যা আশ্চর্য তা হল এই সব আক্রমণকারী চিংড়িগুলো অস্বাভাবিক দীর্ঘ। প্রত্যক্ষদর্শী অনেকেই জানিয়েছেন সেগুলো এক-একটা দশ-বারো ফুটের কম নয়। চিল্কা হ্রদে মাছ ধরা জেলেদের মধ্যে এখন এক ভয়াবহ আতঙ্কের সৃষ্টি হয়েছে। ফলে চিল্কায় বর্তমানে সমস্ত রকম মাছ ধরা বন্ধ। সরকারী তদন্ত শুরু হয়েছে। কিন্তু সরকারী অফিসারেরা মোটর বোটে সারা চিল্কা হ্রদটা গত কয়েকদিন যাবৎ চষে ফেলেও কোন রকম অস্বাভাবিক কিছু দেখতে পান নি। এরপর সরকারী আশ্বাসে গত দুদিন আগে কয়েকজন জেলে ডিঙি নিয়ে সাহস করে মাছ ধরতে গিয়ে আর ফেরে নি।

পুলিশ পরে উল্টানো ডিঙি আর একটা মৃতদেহ উদ্ধার করেছে। মৃতদেহের সর্বাঙ্গে গভীর ক্ষত চিহ্ন—কেউ যেন শরীরের মাংস খুবলে

নিয়েছে। এর পর থেকে কোন জেলে আর চিল্কা হ্রদের ত্রিসীমানায় পা বাড়াতে সাহস করছে না। চিল্কা হ্রদ থেকে 'শেল-ফিস' এবং বাগদা চিংড়ি রপ্তানী করে সরকার বছরে প্রায় দশ থেকে বারো কোটি টাকা বৈদেশিক মুদ্রা আয় করেন। সরকার সমস্ত বিষয়টা নিয়েই উচ্চ পর্যায়ের তদন্তের কথা চিন্তা করছেন।

খবরটা পড়া শেষ করে কাগজ থেকে মুখ তুলে দেখি মেঘনাদ ঘরের জানলার কাছে উত্তাল সমুদ্রের দিকে চোখ রেখে অন্যমনস্কভাবে দাঁড়িয়ে আছে।

একটু বাদে মেঘনাদ মুখ ফেরাল। বললো, একটা স্বাভাবিক আকৃতির বাগদা চিংড়ি কত বড় হতে পারে বলতে পারিস অর্ণব ?

—হাতখানেকের বেশি নয় নিশ্চয়ই। আমি বললাম।

—অথচ চিল্কার জলে দশ-বারো ফুট আকারের বাগদা চিংড়ির ঝাঁক ঘুরে বেড়াতে জেলেরা স্বচক্ষে দেখেছে।

—জেলেরা তো সারা জীবন মাছেদের সঙ্গেই জীবন কাটাচ্ছে। তারা সবাই কি এত ভুল করতে পারে ?

—আমিও তো সেই জন্যই ব্যাপারটা উড়িয়ে দিতে পারছি না। দশ-বারো ফুট চিংড়ির রহস্যটা কি ?

এর উত্তর আমারও জানা নেই, তাই চুপ করে রইলাম।

পাঁচ

[মেঘনাদের চিংড়ি চর্চা]

সেই দিনই সন্ধ্যেবেলা দুর্জয়সিংহবাবু আর ওঁর স্ত্রীর সঙ্গে গিয়েছিলাম পুরীর বাজারে জিনিসপত্তরের দরদাম দেখতে। মেঘনাদ যায় নি, বলেছে, ওর কতকগুলো জরুরি কাজ আছে।

ওর কথায় আমি আর অবাক হই না। কথায় বলে ঢেঁকি স্বর্গে গেলেও ধান ভাঙে। আর ও তো সাংবাদিক—ঢেঁকিরও এক কাঠি ওপরে।

দুর্জয়সিংহবাবু নিজের আর স্ত্রীর জন্য এক জোড়া করে হরিণের চামড়ার জুতো কিনে বগলদাবাই করলেন। আমি কিনলাম একটা ঝিনুকের জাহাজ। বাড়ি গিয়ে সাজিয়ে রাখবো।

কেনাকাটা সেরে হোটেলের ঘরে ফিরে দেখি মেঘনাদ তন্ময় হয়ে কি একটা ম্যাগাজিন পড়ছে।

আমি ঘরে ঢুকতে মেঘনাদ ম্যাগাজিনের দিকে চোখ রেখেই বললো, বোস্।

—কি পড়ছিলি এতক্ষণ মন দিয়ে? আমি জিগ্যেস করলাম।

—'গভর্ণমেণ্ট অফ ওড়িশা' প্রকাশিত একটা পুরনো জার্নালে চিল্কা সম্পর্কে একটি তথ্যবহুল প্রবন্ধ।

আমি বললাম—এতক্ষণে বুঝলাম তোর জরুরি কাজ। কিন্তু এ আর প্রবন্ধ পড়ে জানার কি আছে? চিল্কা একটা মনোরম বড় হ্রদ, হ্রদের জলে আছে প্রচুর মাছ, বিশেষ করে 'শেল-ফিস' আর বাগদা চিংড়ি।

মেঘনাদ বললো—এসব তোপা ড়ার হীরু মুদিও বলতে পারবে; কিন্তু কোন বিষয়ে মাথা ঘামাবার আগে সে সম্পর্কে খুঁটিনাটি তথ্যগুলোও জানা দরকার।

আমি উত্তরে একটা কিছু বলার আগেই মেঘনাদ আবার বললো—তুই কি জানতিস চিল্কাকে আমরা হ্রদ বললেও ভৌগোলিক বিশেষজ্ঞদের মতে আসলে চিল্কা দেশের সর্ববৃহৎ 'লেগুন'। কারণ এর এক দিক বঙ্গোপসাগরের সঙ্গে যুক্ত আর গভীরতাও বেশি নয়। গ্রীষ্মে মাত্র ০·৯৪ মিটার থেকে ২·৬৯ মিটার আর বর্ষায় ১·৭৫ থেকে ৩·৭০ মিটারের মধ্যে সীমাবদ্ধ।

—তার মানে তুই কি বলতে চাস, যে সমস্ত বাগদা চিংড়ির ঝাঁক চিল্কায় জেলেদের নৌকো আক্রমণ করেছে তারা আদপে ওই হ্রদের প্রাণীই নয়। এসেছে বঙ্গোপসাগরের সংযোগের পথ ধরে ? আমি বললাম।

—বঙ্গোপসাগর থেকে এসেছে তো বটেই, তবে ওই রাক্ষুসে চিংড়িগুলিই শুধু নয়, চিল্কার হ্রদে সমস্ত দামী মাছই সমুদ্রের মাছ। এরা ডিম পাড়ার সময় হলে হ্রদ আর সমুদ্রের সঙ্গমস্থল দিয়ে সমুদ্রের জলে চলে যায় আবার কিছুকাল বাদে কাচ্চাবাচ্চা নিয়ে ফিরে আসে।

মেঘনাদের 'চিল্কা গবেষণা' আমার মাথার মধ্যে সব যেন গুলিয়ে দিতে লাগলো। তাড়াতাড়ি বললাম,—এ সব তথ্য থেকে তুই কি সিদ্ধান্ত টানতে চাস ?

মেঘনাদ বললো—সিদ্ধান্ত টানার সময় এখনও আসেনি অর্ণব, তবে দুটো ব্যাপার প্রথমেই জানা দরকার—প্রথমতঃ, এমন কি কারণ থাকতে পারে যার ফলে এক হাত লম্বা বাগদা চিংড়ি দশ-বারো ফুটের রাক্ষুসে বাগদা চিংড়িতে পরিণত হয়, এবং দ্বিতীয়তঃ, তারা শুধু জেলে ডিঙ্গিই আক্রমণ করে, সরকারী অনুসন্ধানী দল তাদের দেখা পায় না।

বুঝলাম মেঘনাদ রহস্যের গন্ধ পেয়েছে।

ছয়

[সমুদ্র বিজ্ঞানী প্রফেসর ইয়ামামোতা]

মেঘনাদের ভাগ্যটা আমি দেখছি বরাবরই বেশ ভাল। মানে যখনই যেটি দরকার কোথা থেকে ও যেন ঠিক সময়ে পেয়ে যায়। এবারেও তার ব্যতিক্রম হল না।

সন্ধ্যেবেলা পুরীর স্বর্গদ্বারের কাছে সমুদ্রের বালির ওপর আমি আর মেঘনাদ পাশাপাশি বসে চিল্কার চিংড়ি রহস্য নিয়েই কথা বলছিলাম। আজই সকালে মেঘনাদ 'তাজা খবরের' মালিক হরিসাধনবাবুর কাছে এখানকার এই আশ্চর্য ব্যাপারটা জানিয়ে তা অনুসন্ধানের জন্য আরও কয়েকটা দিন ছুটির দরখাস্ত পাঠিয়ে দিয়েছে। এবং জানি হরিসাধনবাবু এ দরখাস্ত সাগ্রহে মঞ্জুর করবেন।

সমুদ্রের ধারে খুব একটা ভিড় নেই। কারণ সময়টা বর্ষাকাল। তবু কিছু কিছু ভ্রমণবিলাসী এখানে ওখানে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে। স্থানীয় বাচ্চা ছেলে মেয়েরা ঝিনুক কিংবা পুঁতির মালা, ঝিনুকের সিঁদুর কৌটো, ধূপদানী, শঙ্কর মাছের দাঁত এসব ফেরী করে বেড়াচ্ছে ঘুরে ঘুরে। দুচারটে ফুচকাওয়ালাকে ঘিরে কিছু উঠতি বয়সের ছেলেমেয়েদের ভিড়। পশ্চিম আকাশে সূর্য ডুবছে আকাশ রাঙা করে, সমুদ্র থেকে নুলিয়ারা নৌকো নিয়ে ফিরে আসছে সারি সারি। মাঝে মাঝেই সমুদ্রের ঢেউ এসে পা ধুইয়ে দিচ্ছে। মনোরম বাতাসে বেশ লাগছিল এভাবে বসে গল্প করতে।

হঠাৎ দূর থেকে একটা হাঁকডাক শুনলাম,—মেঘনাদবাবু, মেঘনাদ বাবু।

তাকিয়ে দেখি বালির ওপ্রান্তে রাস্তার ওপরে দুর্জয়সিংহবাবু দাঁড়িয়ে ডাকাডাকি করতে করতে এদিকেই দৃষ্টি সঞ্চালন করে আমাদের খুঁজছেন। দুর্জয়সিংহবাবুর সঙ্গে আর একজন ব্যক্তিও রয়েছেন। দুর্জয়সিংহবাবু মাঝে মাঝেই তার দিকে তাকিয়ে কি যেন বলছেন আর হাঁক পাড়ছেন।

মেঘনাদও লক্ষ্য করে উঠে দাঁড়িয়েছে। আমিও উঠলাম।

দুর্জয়সিংহবাবু এতক্ষণে আমাদের দেখতে পেয়েছেন এবং সঙ্গের ভদ্রলোককে নিয়ে বালির উপর দিয়ে এদিকেই আসছেন।

আমরা কাছাকাছি হতেই দুর্জয়সিংহবাবু সহাস্যে বললেন, দেখুন, মশাই কাকে ধরে এনেছি। আপনার অনেক কিছু জ্ঞাতব্য তথ্য হয়তো ইনিই আপনাকে সাপ্লাই করতে পারবেন।

দুর্জয়সিংহবাবু পরিচয় করিয়ে দিলেন। ভদ্রলোকের নাম প্রফেসর ইয়ামামোতো, জাতে জাপানী। পেশা এবং নেশায় একজন সমুদ্র বিজ্ঞানী। বয়স গোটা পঞ্চাশ হবে, শক্ত সমর্থ চেহারা। পৃথিবীর সমুদ্রগুলির পরিবেশ দূষণ ও তেজস্ক্রিয়তা সামুদ্রিক প্রাণী ও গাছপালার ওপর কি ক্ষতিকর প্রভাব বিস্তার করছে তাই নিয়ে সম্প্রতি গবেষণায় রত।

কিছুক্ষণের মধ্যেই মেঘনাদের সঙ্গে প্রফেসর ইয়ামামোতার আলাপ বেশ জমে উঠলো। ভদ্রলোক স্বভাবে খুবই হাসিখুশি। আমি দেখেছি এটি জাপানীদের জাতের বৈশিষ্ট্য। সৌজন্য প্রকাশে ওদের জুড়ি নেই। প্রফেসর ইয়ামামোতো আলাপের পর থেকে কতবার যে আমাদের "মোশে মোশে" করলেন তার ঠিক নেই। যার বাংলার অর্থ অভিনন্দন।

সেদিন সন্ধ্যে গড়িয়ে যাবার পরও অনেকক্ষণ মেঘনাদের সঙ্গে এই জাপানী সমুদ্র বিজ্ঞানীর কথাবার্তা চললো। চিল্কা হ্রদে বর্তমানে যে দশ-বারো ফুট দৈর্ঘ্যের বাগদা চিংড়ির আবির্ভাব ঘটেছে এ সম্পর্কে উনি কিছু জানেন কি না মেঘনাদ জিগ্যেস করতে উনি বললেন, খবরটা

উনি আগেই সংগ্রহ করেছেন তবে একজন সমুদ্র বিজ্ঞানী হিসেবে এ নিয়ে এক্ষুনি কোন মন্তব্য করতে চান না, কারণ সমুদ্র সম্পর্কে যতটুকু জ্ঞান ওঁর আছে তাতে এমন কোন বাগদা চিংড়ির অস্তিত্বের কথা উনি শোনেন নি।

মেঘনাদ বললো—সমুদ্রের জলে কোনরকম তেজস্ক্রিয়তার ফলে মাছের এই অস্বাভাবিক আকার প্রাপ্তি কি হতে পারে ?

এবার একটু ভাবলেন প্রফেসর, তারপর বললেন—এটা যে সম্ভব নয় তা আমি বলছি না মিঃ ভরদ্বজ, কিন্তু তেমন হলে তো হ্রদের অন্যান্য মাছের ওপরও তার প্রভাব পড়তো। তা ছাড়া গত মাস-খানেক যাবৎ পুরী থেকে কয়েক মাইল দূরে বঙ্গোপসাগরে আমার যে জাহাজ নোঙ্গর করা রয়েছে এবং সেখানে বসে সমুদ্র প্রাণীদের নিয়ে যে পরীক্ষা নিরীক্ষা চালাচ্ছি—সেখানে তো এরকম কোন তেজস্ক্রিয়তার সন্ধান আমি পাইনি।

মেঘনাদ বললে—প্রফেসর, এমন কি হতে পারে না যে এই তেজস্ক্রিয়তার ব্যাপারটি ঘটেছে দূর সমুদ্রের কোন অংশে। এখানে তার প্রভাব এসে পড়েনি বটে কিন্তু সেখানকার তেজস্ক্রিয় কয়েকটি বাগদা চিংড়ি অস্বাভাবিক বিবর্তন নিয়ে কোন রকমে হাজির হয়েছে বঙ্গোপ-সাগর আর চিল্কা হ্রদের সংযোগস্থল দিয়ে চিল্কার জলে। আপনি ভেবে দেখুন প্রফেসর, কী প্রচণ্ড শক্তির অধিকারী এই বিশাল চিংড়িরা! জেলে নৌকা উল্টে দিচ্ছে অক্লেশে ?

প্রফেসর ইয়ামামোতা এবার আর কোন কথা বললেন না। ওঁকে বেশ চিন্তান্বিত মনে হল।

রাত বেড়ে চলেছে। সমুদ্রের জল কালো। উন্মত্ত ঢেউগুলো অন্ধকার তটে কোন অজানা হিংস্র জন্তুর মত সগর্জনে ঝাঁপিয়ে পড়ছে।

আমরা উঠে দাঁড়ালাম। মেঘনাদ এই জাপানী সমুদ্র বিজ্ঞানীকে তখনই হোটেলে আসার আমন্ত্রণ জানাল। উনি বিনীত ভাবে দুঃখ

প্রকাশ করে বললেন, আজ সময় নেই, বরং আর একদিন আসবেন। সেই সঙ্গে সমুদ্রের বুকে ওঁর জাহাজ গবেষণাগার 'সীসান'-এ যাবার আমন্ত্রণ জানাতেও ভুললেন না।

মেঘনাদ আমন্ত্রণ গ্রহণ করলো।

উনি যাবার আগে আমাদের সকলকে আর একবার 'মোশে মোশে' করে বিদায় নিলেন।



হোটেলে ফেরার পথে তুর্জয়সিংহবাবুকে জিগ্যেস করলাম, ভদ্র-লোককে আপনি পাকড়াও করলেন কিভাবে?

তুর্জয়সিংহবাবু সগর্বে বললেন—স্বর্গদ্বারের কাছে যেখানে জেলে-গুলো বসেছিল সেখানে বেড়াতে বেড়াতে দেখি, এই জাপানী ভদ্রলোক ওদের কাছে বাগদা চিংড়ি চালান সম্পর্কে খোঁজ খবর নিচ্ছেন।

কৌতূহলী হয়ে আলাপ করতেই জানলাম, উনি একজন সমুদ্রবিজ্ঞানী —চিল্কার চিংড়ি বিভীষিকার ব্যাপারে উনিও ইণ্টারেষ্টেড। ব্যাস, সঙ্গে সঙ্গে টেনে নিয়ে এলাম মেঘনাদবাবুর কাছে।

মেঘনাদের দিকে আর একবার তাকিয়ে ভ্রূ নাচিয়ে দুর্জয়সিংহবাবু বললেন—বলুন না মেঘনাদবাবু, এসময় একজন সমুদ্রবিজ্ঞানীর মতামত আপনার প্রয়োজন ছিল কি না?

সাত

[সীসান]

পরদিন সকালেই প্রফেসর ইয়ামামোতা নিজে এসে মেঘনাদ আর আমাকে তাঁর সমুদ্র গবেষণা জাহাজ 'সীসান'-এ নিয়ে গেলেন। দুর্জয়সিংহবাবু আমাদের সঙ্গী হলেন।

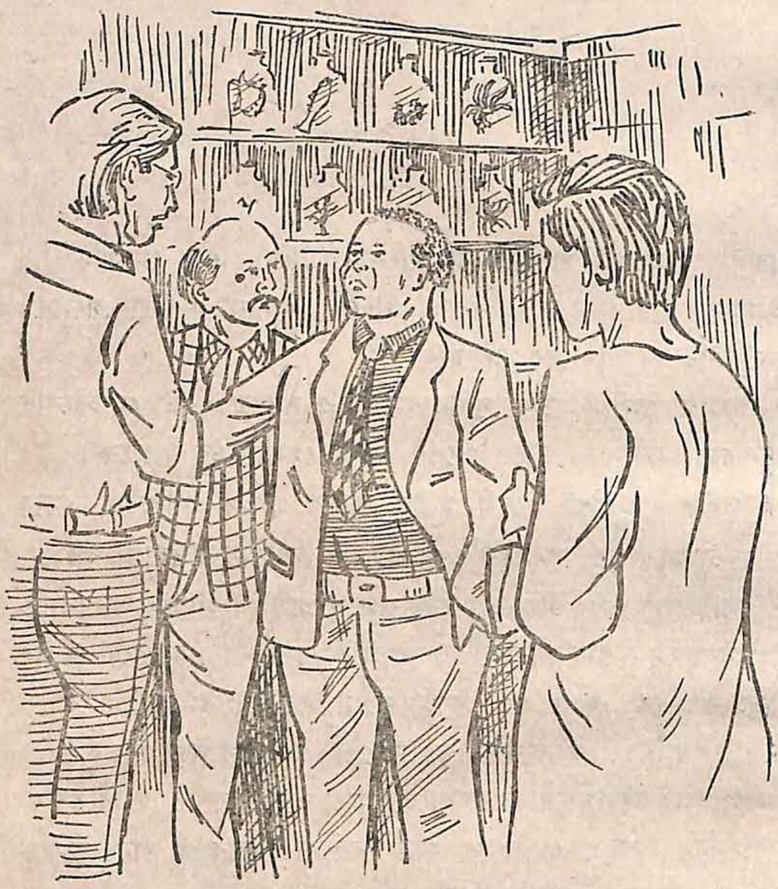
আগে থেকেই উনি পুরীর কাছাকাছি সমুদ্রে একটা মোটরবোট এনে রেখেছিলেন। তাতে চেপেই আমরা গেলাম ওঁর জাহাজে।

পুরীর সমুদ্রতট থেকে মাইল কয়েক দক্ষিণ পশ্চিমে চিল্কার অনেকটা কাছাকাছি সমুদ্রের ওপর ওর বিশাল 'সীসান' নোঙর করা।

জাহাজের ওপর উঠে চোখ যেন ঝলসে গেল। আধুনিক যন্ত্রপাতি এবং সরঞ্জামে বিরাট জাহাজটি সুন্দরভাবে সাজান। ক্যাপটেনের সব কিছুই ঝকঝকে তকতকে। জাহাজের নাবিক এবং কর্মচারীরা বেশির ভাগ জাপানী হলেও দুচারজন স্থানীয় লোকও চোখে পড়লো।

প্রফেসর ইয়ামামোতা জাহাজের মধ্যে তাঁর সুপ্রশস্ত ল্যাবরেটারী দেখালেন। সমুদ্র গবেষণার প্রায় সবরকম বন্দোবস্তই তাতে রয়েছে মনে হল। নানা ধরনের বৈজ্ঞানিক সাজসরঞ্জাম। সেই সঙ্গে বিশাল বিশাল জারে নানা ধরনের মৃত সামুদ্রিক প্রাণী ও উদ্ভিদ কেমিক্যালে ডোবান রয়েছে। এদের মধ্যে আছে নানা দুষ্প্রাপ্য জাতীয় প্রবাল, ষ্টারফিস, সীহর্স, ট্যাফি মাছ, দুই হৃদ্‌পিণ্ডওলা বিষাক্ত মাছ। উদ্ভিদের মধ্যে ফেলস, বিষাক্ত টলসানিয়া, সামুদ্রিক শশা, এছাড়া অক্টোপাসের বাচ্চা, হরেক রকমের হাঙর, ডলফিন, এমন কি সামুদ্রিক ইলিশ, বাগদা চিংড়িও বাদ নেই।

সব কিছু ঘুরে ঘুরে দেখার ব্যাপারে আমাদের মধ্যে তুর্জয়সিংহবাবুর উৎসাহই ছিল সবচেয়ে বেশি।



দেখতে দেখতে ক্ষুব্ধ কণ্ঠে উনি বলে উঠলেন—সাগরের গভীরে কত যে রহস্য লুকিয়ে আছে।

প্রায় সারাটা দিনই আমাদের কেটে গেল প্রফেসর ইয়ামামোতার 'সীসান'-এ। সত্যি বলতে কি, জাহাজের প্রতিটি কর্মচারীর আচরণও আন্তরিকতায় ভরা।

তুপুরে খাওয়ার টেবিলে বসে প্রফেসর বললেন, চিল্কার ওই রাক্ষুসে বাগদা চিংড়ির রহস্য নিয়ে তিনি নিজেও গবেষণা চালাতে চান। এ

ব্যাপারে মেঘনাদের সহযোগিতা তিনি পাবেন কি না।

মেঘনাদ বললো, এ রহস্যের কিনারা না হওয়া পর্যন্ত সে নিবৃত্ত হবে না। সে ইতিমধ্যেই কাজে নেমে পড়েছে।

প্রফেসর ইয়ামামোতা একটু চুপ করে থেকে বললেন, তিনি নিজেও একই পথিক কিন্তু বর্তমানে তার অনুসন্ধান কাজে বিরাট এক অসুবিধে দেখা দিয়েছে এবং সত্যি বলতে কি এই ব্যাপারটা নিয়ে আলোচনা করতেই আরও বিশেষভাবে আজ আমাদের তিনি 'সিসান'-এ আমন্ত্রণ করে এনেছেন।

তাঁর মূল অসুবিধাটা চিল্কার চিংড়ি গবেষণার কাজেই। বর্তমানে ওখানে এই সব অভূতপূর্ব ঘটনাগুলো ঘটতে থাকায় সরকারী তরফ থেকে বিনা অনুমতিতে কোন ব্যক্তির হ্রদে নামা নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। প্রফেসর ইয়ামামোতা তাঁর উদ্দেশ্যের কথা জানিয়ে সরকারী অনুমতির আবেদন জানিয়েছিলেন। লাভ হয় নি। ভিন্‌দেশী বলেই বোধ হয় সরকারী কর্তারা কিছুতেই ওঁকে অনুমতি দিতে চান না।

মেঘনাদ বললো—আমার কাছ থেকে আপনি কি ধরনের সহযোগিতা প্রত্যাশা করেন ?

প্রফেসর ইয়ামামোতা বললেন—আপনি তো চিংড়ি সমস্যা সমাধানে কৃতসংকল্প বললেন, সেই সঙ্গে যদি আমার জন্যেও অন্ততঃ কিছুটা কষ্ট স্বীকার করেন তবে আমার উপকার হয়।

—কি রকম ?

—চিল্কা হ্রদে নামার অনুমতি পাওয়া আপনার পক্ষে আমার মত বিদেশীর থেকে সহজ হবে। জলে যদি নৌকা নিয়ে নামেন এবং ওই সব দশ-বারো ফুটের রাক্ষুসে চিংড়ির সাক্ষাৎ পান তবে অন্ততঃ গোটা কয়েক ফটো তুলে আনবেন আমার জন্যে। আমার মনে হয়, সেই ফটো দেখে হয়তো আমি তাদের বৈশিষ্ট্য কিছুটা উদ্ধার করতে পারবো এবং তখন ব্যাপারটা আপনাদের সরকারকে বুঝিয়ে বিষয়টা নিয়ে আরও গবেষণার সুযোগ পাবো।

মেঘনাদ কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই কিছু মন্তব্য করলো না। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললো—একটা ব্যাপারে আপনাকে সহযোগিতা করার অসুবিধে দেখা দিচ্ছে।

কি অসুবিধে, বলুন ?—প্রফেসর সাগ্রহে বললেন।

—জলের নীচে ভেসে বেড়ান প্রাণীর ফটো তোলার মতো শক্তিশালী ক্যামেরা আমার নেই।

—আপনার নেই, আমার আছে। আমি আপনাকে এখনই ক্যামেরা দিচ্ছি।—প্রফেসর ইয়ামামোতা চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে মেঘনাদের হাত দুটো নিজের দু-হাতের মধ্যে চেপে ধরে পরম আবেগ-মথিত স্বরে বললেন, আপনি যদি এ সহযোগিতাটুকু সত্যিই করতে পারেন মিঃ ভরদ্বাজ, আপনার কাছে আমি চিরকৃতজ্ঞ থাকবো। কারণ জলজ প্রাণীর এ ধরনের আশ্চর্য বিবর্তন নিয়ে গবেষণার সুযোগ আর আগে আমি পাই নি।

কোন ব্যাপারে অতিরিক্ত উচ্ছ্বাস প্রকাশ চিরকালই মেঘনাদের স্বভাববিরুদ্ধ।

প্রফেসর ইয়ামামোতার কথার উত্তরে ও শুধু বললো—আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন, আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করবো।

আট

[বিভীষিকা ঘনীভূত]

পুরীতে আমাদের আরও কয়েকটা দিন কেটে গেল।

ইতিমধ্যে চিল্কার পরিস্থিতির আরও অবনতি ঘটেছে। গত দুদিন আগে লোভের বশে কয়েকজন জেলে নাকি সন্ধ্যের অন্ধকারে পুলিশের চোখ এড়িয়ে চুপি চুপি নৌকা নিয়ে হ্রদে নেমেছিল এবং সেই দশ-বারো ফুট লম্বা বাগদা চিংড়ির ঝাঁকের দ্বারা আক্রান্ত হয়। নৌকা ডুবে একজন নিখোঁজ এবং বাকি কজন কোনক্রমে প্রাণ নিয়ে পালিয়ে আসতে সক্ষম হয়।

সেই থেকে শুধু যে জলে নামার অনুমতির ব্যাপারে পুলিশের আরও সতর্কতা বেড়েছে তাই নয়,কোন জেলে তো দূরের কথা এমন কি চিল্কা হ্রদের কাছাকাছি কোন টুরিষ্ট পর্যন্ত পা মাড়াচ্ছে না। চিল্কাগামী সমস্ত বাসই আপাতত বন্ধ। সব মিলিয়ে গোটা গঞ্জাম আর পুরী জুড়ে এক অদ্ভুত আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছে।

হোটেলের লনে বিকেলবেলা দুর্জয়সিংহবাবুর সঙ্গে বসে এসব ব্যাপারেই কথা হচ্ছিল।

দুর্জয়সিংহবাবু বললেন,—তাজ্জব ব্যাপারখানা দেখেছেন অর্ণববাবু, বাগদা চিংড়ির ঝাঁক বেছে বেছে অ্যাটাক্ করছে শুধুমাত্র নিরীহ জেলে ডিঙ্গি আর নৌকাগুলোকে। একটাও পুলিশলঞ্চ কিন্তু আক্রান্ত হয় নি।

আমি বললাম—এটা খুব আশ্চর্য ব্যাপার বোধ হয় নয়। একটা

পুলিশলঞ্চ বা মোটর বোটকে কায়দা করে উল্টে দেওয়া দশ-বারো ফুট রাক্ষুসে বাগদা চিংড়ির পক্ষেও বেশ কষ্টকর। কিন্তু জেলে ডিঙ্গি হলে তা অসম্ভব নয়।

হুম! আমার যুক্তিটা দুর্জয়সিংহবাবুর বেশ মনে ধরেছে বলেই মনে হলো।

একটু চুপ করে থেকে বললেন—তা না হয় হল, কিন্তু মেঘনাদবাবু যে কি করে এই রহস্যের জাল ছিঁড়বেন এটা তো আমাদের মাথায় আসছে না।

—কেন? আমি প্রশ্ন করি।

—সরকারী কর্তারা হ্রদে নামতে দিতে যে রকম কড়াকড়ি শুরু করেছেন তাতে অনুমতি কি আর মিলবে?

ব্যাপারটা নিয়ে আমিও যে ভাবিনি তা নয়। এ অবস্থায় অনুমতি আদায় করা সত্যিই বড় কঠিন কাজ। মুখে অবশ্য বললাম—দেখা যাক, শেষ অবধি।

দুর্জয়সিংহবাবু বোধ হয় আমার কথার উপরে কিছু বলতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু হঠাৎ রাস্তার দিকে চোখ পড়তে তিনি চেঁচিয়ে উঠলেন—ওই দেখুন, মেঘনাদবাবু ফিরছেন।

তাকিয়ে দেখলাম, মেঘনাদ হোটেলের কাছাকাছি এসে পড়েছে। ওকে খুব নিশ্চিন্ত মনে হচ্ছে। কিন্তু সঙ্গে ও লোকটা কে? কালো বলিষ্ঠ চেহারা। পরনে শুধু একটা নোংরা আটহাতি ধুতি। খালি গা।

নয়

[মেঘনাদের অদ্ভুত প্রস্তাব]

মেঘনাদ সেদিন একই সঙ্গে দুটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ সমাধান করে এসেছে।

প্রথমতঃ সরকারী কর্তৃপক্ষকে তার নিজের পরিচয় দিয়ে চিল্কায় নামবার অনুমতি আদায় করেছে। এ ব্যাপারে দৈবই ওকে কিছুটা সাহায্য করেছে বলতে হবে, কারণ স্থানীয় পুলিশের ডিস্ট্রিক্ট সুপার মিঃ পট্টনায়ক মেঘনাদের পূর্বপরিচিত এবং ওর অনুরাগী বন্ধু। বলতে গেলে তাঁর সুপারিশেই মেঘনাদের পক্ষে অনুমতিটা পাওয়া সহজ হয়েছে।

দ্বিতীয়তঃ মেঘনাদ ফেরার পথে চিল্কায় নৌকা ভাসাবার একজন সাহসী নুলিয়াকেও জোগাড় করে এনেছে।

এ কাজটা অবশ্য মোটেই সহজে হয়নি। মেঘনাদ বলতে কি প্রায় অসাধ্য সাধনই করেছে। এই পরিস্থিতিতে কোন নুলিয়াই হ্রদে নামতে রাজী নয়। পারিশ্রমিক অবশ্য ভালই দিতে হচ্ছে, কিন্তু তা দিয়েও যে কাজ উদ্ধার হয়েছে এই ঢের।

লোকটির নাম ভীম নায়েক। বছর বত্রিশের বিশাল জোয়ান। কথাবার্তা শুনেই বোঝা গেল শরীর আর মনে একই সঙ্গে শক্তি ও সাহস রাখে। না হলে যেখানে টাকার লোভেও আর কেউ রাজী হয় নি, সেখানে সব জেনেশুনেও কেন ও যেতে রাজী হবে?

সেদিন সোমবার। কথা হয়েছে বুধবার দুপুর নাগাদ চিল্কার দিকে যাত্রা করবো।

দুর্জয়সিংহবাবুরও এ অভিযানে প্রচণ্ড উৎসাহ। মেঘনাদকে বললেন—এ বছর পুরীতে এসেও বাগদা চিংড়ির স্বাদ থেকে কেন বঞ্চিত হলাম সেটা চাক্ষুস না দেখে ছাড়ছি না মশাই। আপনার সঙ্গে তো একজন বডিগার্ডও দরকার। এই বয়সেও সে কাজটা আমি ভালই চালিয়ে দেব আশা রাখি।

দুর্জয়সিংহবাবুর এ দুর্জয় উৎসাহ দেখে, সত্যি বলতে, বেশ অবাকই হয়েছি। কারণ ওঁর সঙ্গে আমাদের পরিচয় অতি অল্পদিনের। সেক্ষেত্রে সব জেনেশুনে এই রকম বিপজ্জনক অভিযানে ঝুঁকি নেওয়া একটা 'কিন্তু' থেকেই যায়।

দুর্জয়সিংহবাবুর পীড়াপীড়িতে বাধ্য হয়ে মেঘনাদকে সম্মতি দিতেই হল। শুধু তার আগে ও একবার বললো—আপনার মিসেস, মানে হেমলতা দেবীর পারমিশনটা নিয়েছেন তো ?

উত্তরে প্রচণ্ড সিংহনাদ করে হেসে উঠে দুর্জয়সিংহ বললেন—মশাই, আমার স্ত্রীর চেহারাটি অমন ছোটখাট হলে কি হয় বীরভূমের প্রবল প্রতাপশালী রায়চৌধুরী বাড়ির মেয়ে। আপনি ওর জন্যে কিছু ভাববেন না।

এরপর আর কোন কথা চলে না।

কিন্তু এরপর খাওয়া দাওয়া সেরে ঘরে ঢুকতেই মেঘনাদ যা বললো, তাতে নিজের কানকেই বিশ্বাস করতে পারছিলাম না। এ কি বলছে মেঘনাদ।

—আগামী পরশুদিন চিল্কার অভিযানে আমি কিন্তু তোদের সঙ্গী হতে পারছি না।

মেঘনাদ কি ঠাট্টা করছে। কিন্তু এ কি ধরনের বিদঘুটে রসিকতা।

—ঠাট্টা নয় অর্ণব। আমার মনের কথাটা আন্দাজ করেই মেঘনাদ বললো—আগামীকাল সকাল থেকেই একটা বিশেষ কারণে আমায় গা ঢাকা দিতে হচ্ছে।

সে কি !—আমি বিস্ময়ের কুলকিনারা পাচ্ছি না।

—মানেটা আপাততঃ বলা যাচ্ছে না। তবে এইটুকু জেনে রাখ ভীম নায়েকের সঙ্গে চিল্কায় নেমে রাক্ষুসে বাগদা চিংড়ির ফটো তোলার দায়িত্বটা তোকেই নিতে হবে। আর সঙ্গে তো দুর্জয়সিংহবাবু থাকছেনই।

মেঘনাদের কথাবার্তাগুলো আমার কাছে কেমন যেন ধোঁয়াটে মনে হয়। তবে নিজের অন্তর্ধানের কারণটা মেঘনাদ যখন বলবে না ভেবেছে তখন সে কথা এখন কিছুতেই আদায় করা যাবে না। এখন সমস্যা হল দুর্জয়বাবুকে ব্যাপারটা বোঝান।

মেঘনাদই উপায়টা বলে দিল। আগে থেকেই ও ভেবে রেখেছে এ সম্বন্ধে। পরদিন দুর্জয়বাবুকে ও নিজেই জানাবে ঃ কলকাতায় ওর কর্মস্থল থেকে ওর বস্ হঠাৎ বিশেষ প্রয়োজনে ট্রাঙ্ককলে খবর পাঠিয়ে কয়েকদিনের জন্য কলকাতায় ফিরতে বলেছেন।

মেঘনাদকে তাই যেতে হলেও দু'চার দিনের মধ্যেই ও আবার কাজ মিটিয়ে ফিরে আসবে। ইতিমধ্যে আমি আর দুর্জয়সিংহবাবু চিল্কা হ্রদ পর্যবেক্ষণের কাজটা এগিয়ে রাখব। কারণ অনেক কষ্টে একটি নির্দিষ্ট দিনের জন্যই কেবল হ্রদে নৌকা ভাসাবার অনুমতি পাওয়া গেছে।

মেঘনাদের যুক্তিটা মন্দ নয়। কিন্তু মেঘনাদের আসল উদ্দেশ্যটা কি ?

আমায় ঘোরতর চিন্তামগ্ন দেখে মেঘনাদ সান্ত্বনা দিয়ে বললো—ঘাবড়িও না বন্ধু, ঠিক সময়ে ঠিক জায়গায় আমরা আবার মিলিত হব। শুভরাত্রি।

দশ

[অভিযানের উদ্যোগ]

বুধবার দুপুরের মধ্যেই আমাদের চিল্কা অভিযানের আয়োজন সম্পূর্ণ হয়ে গেল।

অবশ্য উদ্যোগ আয়োজন বলতে যা কিছু দুর্জয়সিংহবাবু একাই প্রায় সব কিছু করলেন। এমন একটা দুঃসাহসী দুর্জয় অভিযানের 'নেতৃত্ব' তাঁর ওপর বর্তেছে জেনে তাঁর হৈ চৈ প্রচণ্ডভাবে বেড়ে গেছে।

মেঘনাদ গতকাল বিকেল থেকেই কথানুযায়ী নিপাত্তা।

যাবার আগে ও দুর্জয়সিংহবাবুকে কলকাতা থেকে ট্রাঙ্ককলের কথাটা বলেছিল। দুর্জয়সিংহবাবু তা বিশ্বাস করে নিতে তিলমাত্র দেরী করেন নি।

লোকটা কি নেহাতই সরল না অতি বুদ্ধিমান।

শুধু তাই না, যাবার আগে মেঘনাদ যখন বলেছিল, এ অভিযানের মূল নেতৃত্ব কিন্তু আপনার ওপরই দিয়ে গেলাম, দুর্জয়সিংহবাবু পরম আত্মবিশ্বাসে মেঘনাদের কাঁধে আলতো চাপড় মেরে বলেছিলেন, কিচ্ছু ভাববেন না, আগামীকাল বিকেলে চিল্কায় গিয়ে গোটা কয়েক রাক্ষুসে বাগদার ঘাড় মটকে যদি না আনি তবে আমার নামই দুর্জয় নয়।

শুনে মুচকি হেসে মেঘনাদ যাবার সময়ে আমায় আড়ালে বলে গিয়েছিল, মানুষটাকে নিয়ে একটু সামলে চলিস অর্ণব।

এসব কথা গতকালের। তারপর, মেঘনাদ চলে যাবার পর থেকেই

আমাদের অভিযানের উদ্যোগ শুরু হয়েছে।

অবশ্য সঙ্গে বিশেষ কিছু নেবার নেই। কে জানে কেন মেঘনাদ সঙ্গে কোন রকম অস্ত্র নিতে বারণ করেছে। তবু একটা ছোট ভোজালী কোমরে গুঁজে নিয়েছি। এ ছাড়া আছে প্রফেসর ইয়ামামোতার দেওয়া সেই চমৎকার ক্যামেরাটা—যার সাহায্যে জলের কিছুটা নীচের ছবিও অতি পরিষ্কারভাবে তোলা যায়। আর এই সঙ্গে আছে পাঁচ ব্যাটারীর একটা বড় টর্চ।

দুর্জয়সিংহবাবু আরও কিছু খুঁটিনাটি নিয়েছেন দেখলাম। এর মধ্যে প্ল্যাস্টিকের মজবুত দড়ি এবং 'ফার্ষ্ট এড্ বক্স'ও রয়েছে।

—'ফার্স্ট এড্ বক্স' এখানে কি কাজে লাগবে দুর্জয়সিংহবাবু?

'ফার্স্ট এড্ বক্স'-এর প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে ওঁকে প্রশ্ন করলে উনি খুব চালাকের মতো হেসে বললেন, রাক্ষুসে বাগদা চিংড়ির দাড়াগুলো কেমন ধারাল হতে পারে ভেবে দেখেছেন? যদি সত্যি সত্যিই ওগুলোর সঙ্গে হাতাহাতি হয় তবে আহত হলে তক্ষুণি ফার্স্ট এড্ পাবেন কোথায়?

এর পর আর কি বলতে পারি?

ভীম নায়েক এল দুপুর গড়িয়ে যাবার পর। বললো, জীপের যোগাড় করতে নাকি দেরী হয়ে গেছে।

আমরা হোটেল থেকে বেরুবার আগে হেমলতা দেবী আগে থেকে নিয়ে আসা জগন্নাথদেবের প্রসাদী ফুল আমাদের সকলের মাথায় ঠেকিয়ে দিলেন তারপর আমায় ডেকে চুপি চুপি বললেন, একটু দেখো ভাই মানুষটাকে। বড় অবুঝ।

হেমলতা দেবীর মুখের দিকে তাকিয়ে এক মুহূর্তেই স্বামীর প্রতি তাঁর উৎকণ্ঠিত অকৃত্রিম মনের ছবিটা চোখের সামনে ভেসে উঠলো।

বললাম—আপনি কিচ্ছু ভাববেন না বৌদি···!

আর কিছু বলার আগেই হোটেলের বাইরে থেকে দুর্জয়সিংহবাবুর হাঁকডাক শুনলাম—কি হল অর্ণববাবু, বন্ধুটির পথ ধরে নিজেও কেটে

পড়ার তাল খুঁজছেন নাকি ?

অগত্যা প্রায় দৌড়েই বেরিয়ে পড়লাম।

জীপ অপেক্ষা করছিল।

আমরা উঠে বসতেই জীপ ছুটে চললো চিল্কার দিকে।

কিন্তু তখনও কি কল্পনায়ও ভেবেছিলাম আমাদের এ অভিযানের পরিণতি যেমন অদ্ভুত তেমনি অবিশ্বাস্য !

এগার

[রাক্ষুসে চিংড়ির কবলে]

ভীম নায়েক আমাদের ছুজনকে নিয়ে যখন চিল্কার বুকে ডিঙি ভাসালো তখনই দিনের আলো কমে আসতে শুরু করেছে।

পশ্চিম আকাশে সূর্যের রঙ গাঢ় লাল। জলে পড়েছে তার রক্তিম প্রতিফলন। দিকচক্রবালে আকাশ এসে মিশেছে হ্রদে। মাঝে মাঝে ডানা মেলে উড়ে যাচ্ছে কিছু পাখি।

ভীম নায়েকের ডিঙিটা বেশ বড়ই বলতে হবে। নৌকোর মধ্যে আছে গোটা তিনেক লাইফ বেল্ট—যাতে জলে পড়লেও ভেসে থাকা যায়। বেল্টগুলো আগে থেকেই আমাদের কোমরে বাঁধা ছিল।

কিন্তু আমাদের সঙ্গে কোন রকম অস্ত্র নিয়ে আসতে মেঘনাদ আপত্তি করেছিল কেন আমার কাছে তা এখনও স্পষ্ট নয়।

হ্রদে নামার পর প্রায় ঘণ্টাখানেক হয়ে গেল। অনেকটা ভেতরে চলে এসেছি—কিন্তু এখনও চোখে পড়ার মতো কিছু দেখিনি।

দূরে দূরে ছু-একটা পুলিশের টহলদারী মোটর বোট চোখে পড়ছে কিন্তু তাও অন্ধকারে ক্রমশঃ ঝাপসা হয়ে আসছে।

গাঢ় অন্ধকার নামছে চিল্কায়।

জলের রঙ বদলাতে শুরু করেছে দ্রুত।

চারিদিক নিঃঝুম। আমরা সবাই নির্বাক হয়ে গেছি। শুধু নিস্তব্ধতা ভেঙে নিকষ কালো জল কেটে ছপ্ ছপ্ করে দাঁড় টেনে এগিয়ে চলেছে ভীম নায়েকের নৌকো।



কেটে যাচ্ছে সময়···মুহূর্ত···মিনিট !

নৌকোর কাছাকাছি জলের মধ্যে একটা আলোড়ন উঠলো না ?

ভীম নায়েকের ফিস ফিস কণ্ঠস্বর শুনলাম, পানিতে আলো দিন বাবু !

জলের মধ্যে নৌকোর পাশে কয়েক জোড়া আগুনের গোলা জ্বলে উঠেছে।

আমার হাতের পাঁচ ব্যাটারী টর্চের তীব্র আলো ঝলসে উঠলো সেদিকে লক্ষ্য করে।

এ কি দেখছি !

সত্যি সত্যি দশ বারো ফুট আকারের কতকগুলি বিশাল চিংড়ি মাছ আমাদের নৌকোটাকে চারদিক থেকে ঘিরে ফেলেছে। সংখ্যায় ওরা প্রায় বার-তেরটা হবে।

ভীম কাঁপা কাঁপা গলায় বললো—রাক্ষুসে চিংড়ি ! বাপ রে ! আউর বাঁচিবার উপায় নাই।

ওই বিশাল চেহারার মানুষটাও রীতিমত ভয় পেয়েছে।

কিন্তু আশ্চর্য সাহস দুর্জয়সিংহবাবুর। এই অবস্থার মধ্যেও একটা ছোটখাট সিংহনাদ করলেন—অর্ণববাবু, শীগগির ক্যামেরাটা রেডি করে কয়েকটা ফটো তুলে···

কিন্তু ওঁর কথা আর শেষ হল না।

একটা প্রচণ্ড ঝটকায় আমাদের নৌকোটা শূন্যে উৎক্ষেপিত হল। তারপর আমরা তিনজনেই ছিটকে পড়লাম চিল্কার ঠাণ্ডা জলে।

চারদিক থেকে রাক্ষুসে বাগদা চিংড়ির দল তখন ক্রমেই আমাদের কাছে এগিয়ে আসছে। চিংড়ি মাছের শরীর যে এত ভয়ঙ্কর হতে পারে এ-ধারণা আগে ছিল না।

আগুনের গোলার মতো চোখগুলো জ্বেলে বড় বড় দাড়া নাড়তে নাড়তে ওরা এগিয়ে আসছে আরও কাছে পালাবার। কোন উপায় নেই।

তবু শেষ চেষ্টা করতে হবে। নিজে মরবার আগে যে কটাকে পারি ঘায়েল করবো। কোমর থেকে ভোজালিটা বার করে সামনের বাগদা চিংড়িটাকে লক্ষ্য করে আঘাত হানতে যাবো আচমকা একটা বাগদা আমার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে তার শক্ত শুঁড়গুলো দিয়ে আমার হাত পা কায়দা করে আটকে ফেললো। হায়, আজই আমার জীবনের শেষ দিন।

মাথাটা ঝিম ঝিম করছে। এবার বুঝি অজ্ঞান হয়ে যাবো। কিন্তু জ্ঞান হারাবার পূর্ব মুহূর্তে কানের কাছে অতি পরিচিত এক স্বর শুনলাম—ভয় নেই, আমি আছি।

আশ্চর্য! কে কথা বললো? এ কণ্ঠের অধিকারী তো একজনই।

কিন্তু তার গলা এখন, এ পরিস্থিতিতে শুনবো কি করে?

কিন্তু সে কথা ভাবার সময় পেলাম না, তার আগেই একরাশ অন্ধকার এসে গ্রাস করে নিল আমার সমস্ত চেতনা।

বারো

[বন্দীদশায় দুর্জয়সিংহবাবুর 'ফাস্ট' এড্']

জ্ঞান ফিরল একটা অন্ধকার স্যাঁতসেঁতে জায়গায়। কেমন যেন একটা বোটকা আঁশটে গন্ধ ভেসে আসছে।

প্রথমেই আমার যে কথাটা মনে এল, তা হচ্ছে সত্যিই আমি বেঁচে আছি কি না। কারণ, মনে পড়ছে, যে অবস্থায় আমি ওই ভয়াবহ রাক্ষুসে মাছগুলোর খপ্পরে পড়েছিলাম তারপরও প্রাণ নিয়ে বেঁচে থাকার কথা নয়।

কিন্তু বেঁচে না থাকলে সব কিছু অনুভব করছি কি করে?

আমার হাত দুটোই বা বাঁধল কে? আর যেখানে আছি সেটা তো একটা ছোট্ট বন্ধ ঘরের মতোই মনে হচ্ছে।

এটা কোন জায়গা?

অন্ধকারটা চোখে আস্তে আস্তে সয়ে এল। ঘরের অন্যদিকে কে একজন মুখ গুঁজে পড়ে রয়েছে না? উঠে দাঁড়াতে গিয়েই মাথায় ঠোক্কর লাগলো। ঘরের সিলিং বেশ নীচু। প্রায় হামাগুড়ি দিয়েই অন্য লোকটির কাছে গিয়ে পৌঁছলাম।

লোকটির গায়ে হাত দেওয়ার আগে সে বলে উঠলো, এসময় ফার্স্ট এড্ বক্সটা যদি থাকতো সত্যিকারের উপকার হত।

এ গলা চিনতে ভুল হবার কথা নয়—দুর্জয়সিংহবাবু ছাড়া আর কে?

উনি মুখ নীচু করে বাঁ পায়ের বুড়ো আঙুল চুষছিলেন।

শুনলাম, একটু আগেই নাকি ওঁর জ্ঞান ফিরেছে। তারপরই বাঁ

পায়ে ব্যথা অনুভব করতে দেখেন বুড়ো আঙ্গুল থেকে রক্ত চুঁইয়ে পড়ছে। বোধ হয় হ্রদের জলে রাক্ষুসে চিংড়ির দাড়ার আঘাতেই এ দশা। উনি এতক্ষণ বুড়ো আঙুল চুষে রক্ত বন্ধ করার চেষ্টা করছিলেন।

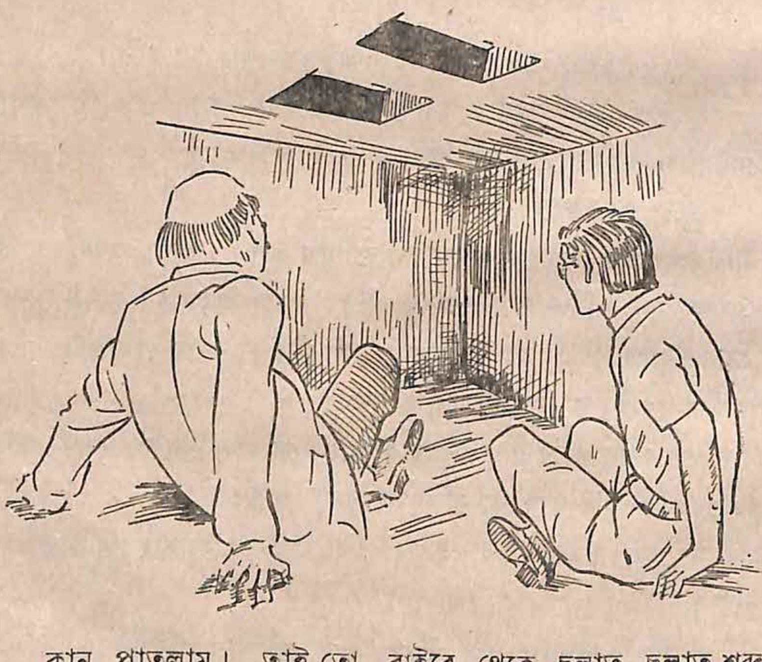
এত বিপদের মধ্যেও হাসি এল। এ অবস্থাতেও দুর্জয়সিংহ চক্রবর্তী তাঁর ফার্স্ট এড্ বক্স-এর কথা ভোলেন নি।

বললাম—আপনার ফার্স্ট এড্ কি প্রাণ ফিরিয়ে দিতে পারবে?

—তার মানে? দুর্জয়সিংহবাবু মুখ তুললেন।

—তার মানে এই অন্ধকার বদ্ধ জায়গাটা তো মৃত্যুগুহা ছাড়া আর কিছু মনে হচ্ছে না। জায়গাটা কোথায় কিছু বুঝতে পারছেন?

—আমার তো মনে হচ্ছে কোন নদী, হ্রদ বা সমুদ্রের ওপরই রয়েছি আমরা। দুর্জয়সিংহবাবু বললেন—জলের আওয়াজ শুনতে পাচ্ছেন?



কান পাতলাম। তাই তো, বাইরে থেকে ছলাত ছলাত শব্দ ভেসে আসছে। এই সঙ্গে ঘরের ওপর দিকে সিলিং-এর কাছাকাছি

যে ছোট্ট ফোকরটা রয়েছে ওখান থেকে ঠাণ্ডা বাতাস ঢুকছে।

সিলিংটা বেশ নীচু। তাই কোনরকমে দেয়াল ধরে উঠে দাঁড়িয়ে ফোকরে চোখ রাখা অসম্ভব হল না।

বাইরে কালো পিচের মতো অন্ধকার। আকাশে চাঁদ নেই। শুধু লক্ষ লক্ষ তারার চুমকি। আমরা কোথায় আছি কিছুই বোঝা গেল না। তবে জলের ওপর যে রয়েছি এটুকু শুধু বুঝলাম।

এই সময় একটা কথা স্বাভাবিক ভাবেই মনে এল। চিল্কার জলে যদি আমরা তেজস্ক্রিয় বাগদা চিংড়ির দ্বারাই আক্রান্ত হই তবে তারা আমাদের হত্যা না করে বন্দী করে আনলো কি ভাবে?

তবে কি চিংড়ি রহস্যের পেছনে অন্য কারুর হাত আছে?

ভীম নায়েক লোকটাকে ঠিক আমার পছন্দ হয় নি। সেটা অবশ্য তার চেহারার জন্যেই। তাকেও তো দেখছি না। তবে কি···?

হঠাৎ মনে পড়লো মেঘনাদের কথা। হ্রদের জলে রাক্ষুসে বাগদা চিংড়ির ঝাঁকের মধ্যে অজ্ঞান হয়ে যাবার পূর্ব মুহূর্তে যে অভয়-বাণী কানে শুনেছি—তা তো তারই। কিন্তু তাই বা কি করে সম্ভব?

বাইরে পদশব্দ।

ঝনাং করে ঘরের দরজাটা খুলে গেল। জনা তিনেক বলিষ্ঠ চেহারার লোক ঘরে ঢুকলো। ওদের একজনের হাতে একটা উদ্যত রিভলবার।

রিভলবারধারী উড়িয়া ভাষায় সঙ্গীদের যে নির্দেশ দিল তার বাংলা অর্থ দাঁড়ায়ঃ চোখ বেঁধে নিয়ে চল সাহেবের কাছে।

তেরো

[বিভীষিকার মুখোমুখি]

একটা সুসজ্জিত ঘরের মধ্যে আমার আর দুর্জয়সিংহবাবুর চোখের বাঁধন খুলে দেওয়া হল। বিহ্বল দৃষ্টিতে তাকিয়ে দেখতে লাগলাম। আশ্চর্য! ঘরটা খুবই চেনা মনে হচ্ছে। এখানে কি আগে কখনও এসেছি?

—মোশে মোশে ইয়াংম্যান।

চমকে দৃষ্টি ফিরিয়ে দেখি এক কোনে একটা নরম সোফায় শরীর ডুবিয়ে যে মানুষটি বসে রয়েছে এ পরিস্থিতিতে তাকে একেবারে আশা করিনি।

প্রফেসর ইয়ামামোতা।

এই মুহূর্তে তার ঠোঁটে সর্বদা লেগে থাকা হাসিটা প্রচ্ছন্ন ব্যঙ্গ আর অবজ্ঞায় যেন তিক্ত হয়ে উঠেছে।

আসলে আমরা দাঁড়িয়ে আছি 'সীসান' গবেষণা জাহাজে প্রফেসর ইয়ামামোতার কেবিনে।

আর সে কারণেই জায়গাটা এত চেনা চেনা মনে হচ্ছিল। মাত্র কদিন আগেও আমরা এখানে ঘুরে গিয়েছি।

—ইচ্ছে ছিল পালের গোদা মেঘনাদ ভরদ্বাজকেও একই সঙ্গে খাঁচায় পুরবো। কিন্তু গতকাল রাতেই ভীম নায়েক খবর পাঠালো সে নাকি শেষ মুহূর্তে কলকাতায় পালিয়েছে।—প্রফেসর চোস্ত ইংরেজীতে সুতীব্র ব্যঙ্গভরে বললেন।

শুনতে শুনতে দুটো ব্যাপার আমার মনে বিস্ময়ের চমক সৃষ্টি করলো।

প্রথমতঃ মেঘনাদ এদের হাতে ধরা পড়ে নি।

দ্বিতীয়তঃ আমাদের নৌকোর মাঝি ভীম নায়েক এদের লোক।

—তুমি একজন বিশ্বাসঘাতক, পাজী, হতচ্ছাড়া।—এই অবস্থার মধ্যেও দুর্জয়সিংহবাবু গর্জে উঠলেন।

প্রফেসর ইয়ামামোতার ছোট হলুদ মুখটা একবার কৌতুকে হেসে উঠলো।

—আমায় যা খুশি ভাবতে পারেন আপনারা। আসলে কিন্তু আমি একজন মৎস্যব্যবসায়ী। আমার আসল নাম মিঃ ফুজিয়ান।

—এ্যাঁ! আমার কণ্ঠে প্রচণ্ড বিস্ময়।

—হ্যাঁ। জাপানে আমার একটি মৎস্য আমদানি প্রতিষ্ঠান আছে। বিভিন্ন দেশ থেকে আমি নানা ধরনের দুর্মূল্য মাছ আমদানি এবং রপ্তানি করি।

কিন্তু চিল্কার রাক্ষুসে বাগদা চিংড়ির সঙ্গে আপনার সম্পর্ক কোথায়? —আমি প্রশ্ন না করে পারি না।

—সম্পর্ক তো সবটাই। প্রফেসর ইয়ামামোতা ওরফে মিঃ ফুজিয়ান অদ্ভুত ভঙ্গি করে হাসলেনঃ আপনাদের চিল্কার মাছের বিশেষতঃ বাগদা চিংড়ির সারা পৃথিবীব্যাপী সুনাম। বিশেষ করে জাপান এবং আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে খুবই প্রিয়। কিন্তু সোজা পথে এ মাছ আমদানি করতে আমাকে লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয় করতে হয়। তাই খুব কম খরচে চিংড়ির ঝাঁক আমদানি করার কৌশল অবলম্বন করেছি আমি। অবশ্য আমার এ কৌশল আর কাজটা আইন মাফিক নয় তা স্বীকার করছি।

—কি কৌশল? ব্যাপারটা এখনও আমার কাছে স্পষ্ট নয়।

—চিল্কায় চিংড়ি বিভীষিকা সৃষ্টি।

—ঠিক বুঝলাম না।

এবার আমার কথার উত্তর না দিয়ে মিঃ ফুজিয়ান হঠাৎ হাতে তিনবার তালি বাজালেন।

কী আশ্চর্য !

ওরা কারা ?

মিঃ ফুজিয়ানের তালি শুনে দশ-বারো ফুট দৈর্ঘ্যের গোটাকয়েক রাক্ষুসে বাগদা মোটা মোটা ঠ্যাংএর ওপর ভর দিয়ে দাড়া উঁচিয়ে কেবিন ঘরের সামনে এসে দাঁড়াল।

চিংড়িগুলোর সারা গা যেন ঝক ঝক করছে। কী এগুলো ?

আমি আর দুর্জয়সিংহবাবু ওগুলোর দিকে বিস্ফারিত নেত্রে তাকিয়ে আছি দেখে মিঃ ফুজিয়ান উচ্চকণ্ঠে হেসে উঠলেন। দিন কয়েক আগেও যে মানুষটার মধ্যে এত সৌজন্য আর বিনয় দেখেছি আজ তার এই পরিবর্তিত রূপ দেখে ক্রমেই যেন বাক্যহারা হয়ে পড়ছিলাম।

—এগুলো তাহলে আসলে তেজস্ক্রিয় রাক্ষুসে বাগদা চিংড়ি নয়। কিন্তু কি এগুলো ?

দুর্জয়সিংহবাবুর কথায় মিঃ ফুজিয়ান আর এক চোট হেসে ওদের একজনকে জাপানী হুকুম করলেন—আন্দাজে বুঝলাম উনি মুখোস খুলতে বললেন।

একটা বাগদা চিংড়ির মাথার অংশটা কব্জার মতো খুলে ঝুলে পড়লো। দেখলাম ভেতরে একটা মানুষের মুখ। একজন জাপানী। বুঝলাম নকল চিংড়ির দেহটা অ্যালুমিনিয়াম জাতীয় হাল্কা ধাতু দিয়ে তৈরী।

—এবার আশা করি আমার কৌশলটা আপনারা বুঝতে পারছেন। এই বিশেষ খোলসটা তৈরী করতে অবশ্য আমার কিছু অর্থ ব্যয় হয়েছে ঠিকই। যেমন এদের প্রত্যেকের ধাতব দেহ, জল কেটে এগোনর জন্য মোটর যুক্ত প্রপেলার, অক্সিজেন সিলিণ্ডার ইত্যাদি। তবে এর ফলে আমার লাভ হয়েছে দুদিক থেকে। এই ছদ্মবেশী

চিংড়ির দল চিংড়ি বিভীষিকা সৃষ্টি করে স্থানীয় জেলেদের মাছধরা বন্ধ করেছে, সেই সঙ্গে আমার সাবমেরিন জাতীয় ছোট্ট ডুবোযানের সাহায্যে জলের মধ্যে মাছের ঝাঁক ধরে বঙ্গোপসাগর ও চিল্কার সংযোগ-স্থলের মধ্য দিয়ে আমার এই জাহাজে সরাসরি জমা করেছে। ব্যাপারটা কত মজার ভাবুন দেখি!

দুর্জয়সিংহবাবু একটুও না দমে ফের গর্জে উঠলেন—আপনি কি ভেবেছেন, দিনের পর দিন এই ঘৃণ্য অপকর্ম করে পার পেয়ে যাবেন?

—বাধা দেবে কে? মিঃ ফুজিয়ানের ছোট ছোট চোখ দুটোতে এবার ভয়ঙ্কর হাসি চলকে উঠলো: পুলিশের কাছে গিয়ে এসব কথা বলার সময় আর আপনারা পাবেন না। তার আগেই আপনাদের দেহ দুটো বঙ্গোপসাগরের অতলে সত্যিকারের রাক্ষুসে মাছেদের খোরাক হয়ে যাবে।

হঠাৎ দূর থেকে সমুদ্রের জল কেটে কয়েকটা মোটর বোটের দ্রুত এগিয়ে আসার শব্দ শোনা গেল।

আমাদের নৌকোর মাঝি ভীম নায়েক ছুটতে ছুটতে ঘরে ঢুকলো। উত্তেজিত ভাঙা ভাঙা ইংরেজিতে ও খবর দিল—সাব পুলিশ-থ্রি মোটর বোটস—ওয়ান লঞ্চ কাম...

কিন্তু মিঃ ফুজিয়ান আর কিছু বলার সুযোগ পেলেন না।

সেই অতি পরিচিত কণ্ঠের বজ্র নির্ঘোষ শোনা গেল—হ্যাণ্ডস আপ প্রফেসর ইয়ামামোতা ওরফে মিঃ ফুজিয়ান। ঘরের যে কেউ নড়বার চেষ্টা করবে আমি গুলি করতে বাধ্য হব।

রাক্ষুসে বাগদা চিংড়ির ছদ্মবেশে মিঃ ফুজিয়ানের যে অনুচরেরা কেবিনের সামনে দাঁড়িয়েছিল তাদের মধ্যে একজন তার মুখোস খুলে স্বরূপ প্রকাশ করে ফেলেছে।

সে আর কেউ নয়—স্বয়ং মেঘনাদ। ওর হাতে দুটো ঝকঝকে রিভলবার।

মোটরবোটগুলি এসে থামলো জাহাজের গায়ে। ওরাও এসে পড়েছে।

চৌদ্দ

(কৌশলের জয়)

চিল্কায় মৎস্য চোরাচালানের সমস্ত দলটাকে গ্রেফতার করে এবং সমুদ্র গবেষণা জাহাজ 'সীসান' সার্চ করে তার খোলের মধ্যে থেকে প্রচুর বাগদা, শেলফিস এবং আরও অন্যান্য বহু দুমূ্ল্য মাছ চুরির নমুনা ও প্রমাণ সংগ্রহ করে পুলিশ সুপার মিঃ পট্টনায়কের দলবলের সঙ্গে মোটর লঞ্চে ফেরার পথে মেঘনাদের অদ্ভূত কর্মতৎপরতার গল্প শুনছিলাম।

মেঘনাদ আমাদের সঙ্গে অভিযানে না গিয়ে সম্পূর্ণ একা আরও ভয়ঙ্কর এক অভিযান করেছিল চিল্কার গভীরে।

প্রথম থেকেই প্রফেসর ইয়ামামোতার গবেষণা এবং 'সীসান' জাহাজের প্রকৃত উদ্দেশ্য সম্পর্কে ও সন্দিহান হয়ে পড়ে জাহাজে আমন্ত্রণ রক্ষা করতে গিয়ে। সেই সঙ্গে রহস্যভেদে মেঘনাদের আগ্রহ দেখে ওই হ্রদে যে কোন প্রকারে মেঘনাদকে পাঠাবার ব্যাপারে প্রফেসর ইয়ামামোতার অস্বাভাবিক উৎসাহ ওকে আরও সন্দিগ্ধ করে তুলেছিল।

সরকারী কর্তৃপক্ষের কাছে খোঁজ নিয়ে ও জানতে পারে প্রফেসর ইয়ামামোতা মুখে বললেও আসলে কোনদিনই নিজে থেকে চিল্কায় নামার ব্যাপারে অনুমতি প্রার্থনা করে নি।

নির্লিপ্ত কণ্ঠে মেঘনাদ বলে চলে :

অভিযানের আগের দিন রাতের অন্ধকারে গোপনে 'সীসান' জাহাজে উঠে রাক্ষুসে বাগদা চিংড়ির রূপধারী প্রফেসর ইয়ামামোতার

এক অনুচরকে জখম করে একটা মাছ চালান দেওয়ার খালি পেটির মধ্যে হাত পা মুখ বেঁধে বন্দী করলাম। তারপর চিংড়ির ছদ্মবেশ ধরে লুকিয়ে রইলাম ওদেরই দলের মধ্যে। পরদিন সন্ধ্যেবেলা অন্যান্য চিংড়ি ছদ্মবেশী ডুবুরীদের সঙ্গী হলাম চিল্কা হ্রদে।

এতক্ষণ চিল্কার বুকের সেই ভয়ঙ্কর চিংড়ি আক্রমণের মাঝে মেঘনাদের কণ্ঠস্বর শোনার রহস্য পরিষ্কার হল। ও না থাকলে চিংড়ি ছদ্মবেশী হিংস্র অনুচরেরা হয়তো আমাদের খুন করেই ফেলতো।

আমাদের যখন 'সীসান' জাহাজের বদ্ধ কুঠুরীতে প্রফেসর ইয়ামামোতা ওরফে চোরাচালান দলের সর্দার ফুজিয়ান বন্দী করে রেখেছিল তখনই মেঘনাদ জাহাজের এক গোপন স্থান থেকে পুলিশ সুপার মিঃ পট্টনায়ককে ওয়ারলেসের মাধ্যমে খবর পাঠায়।

পুলিশ সুপার মিঃ পট্টনায়কও আগের কথামতো মেঘনাদের খবরের জন্য অপেক্ষা করছিলেন।

খবর আসার পর তিনি আর এক মুহূর্তও অপেক্ষা করেন নি। সঙ্গে সঙ্গে দলবল নিয়ে বেরিয়ে পড়ে অত্যন্ত তৎপরতার সঙ্গে বাকি কাজটা শেষ করেছেন।

প্রফেসর ইয়ামামোতা ওরফে ফুজিয়ান মোটর লঞ্চের এক কোনে হাতকড়া পরা অবস্থায় বসে বন্দী নেকড়ের মতো দুর্বোধ্য ভাষায় মাঝে মাঝে গর্জন করছিল।

সেদিকে তাকিয়ে একটু হেসে পুলিশ সুপার মিঃ পট্টনায়ক বললেন, —মিঃ ভরদ্বাজ, পেশায় একজন সাংবাদিক হয়েও যে অসাধারণ বুদ্ধিতে একজন পাকা গোয়েন্দার মতো এই বিরাট চক্রটাকে আপনি ধরলেন, তা আমাদের কাছেও বহুকাল একটা দৃষ্টান্ত হয়ে থাকবে।

মেঘনাদ মুখে ছদ্ম গাম্ভীর্য ফুটিয়ে বললো—এ হল বুদ্ধি বা কৌশলের জয়। আর কৌশলের মাহাত্ম্য তো আপনারা, অর্থাৎ কলিঙ্গবাসীরা ভালই বোঝেন।

মেঘনাদের কথায় এতক্ষণ বাদে প্রাণ খুলে হেসে উঠলাম আমি আর দুর্জয়সিংহবাবু। মিঃ পট্টনায়কও হাসিতে যোগ দিলেন।

পনের

[পুনশ্চ]

এর দিন পাঁচেক বাদেই আমরা পুরী ভ্রমণ শেষ করে কলকাতায় ফেরার টিকিট কাটলাম।

দুর্জয়সিংহবাবু তখনও হোটেলে গ্যাঁট হয়ে বসে রয়েছেন। এই কদিন যাবৎ হোটেলের ম্যানেজার নীলমণি মাহাতোকে স্পেশাল চার্জ দিয়ে প্রতিদিন দুবেলা খাবার সময়ে অন্ততঃ খান আষ্টেক করে বাগদা চিংড়ি পাকস্থলিতে পাঠিয়ে এতদিন না খাওয়ার প্রতিশোধ গ্রহণ করে চলেছেন।

আমাদের ফেরার দিন দুর্জয়সিংহবাবু সস্ত্রীক স্টেশনে এসেছিলেন আমাদের বিদায় জানাতে।

হেমলতা বৌদি বললেন, কলকাতায় ফিরে আমাদের কথা মনে থাকবে তো ভাই।

আমি কিছু বলার আগেই দুর্জয়সিংহবাবু সিংহনাদ করে বললেন, ভুলতে দিচ্ছে কে? আপাততঃ কবে ফিরবো বলতে পারছি না, আশা এখনও মেটে নি। তবে কলকাতায় গিয়েই আমার প্রথম কাজ সাংবাদিক-কাম-রহস্যভেদী মেঘনাদ ভরদ্বাজ এবং তার ওয়াটসন অর্ণব সেনকে আমার বাড়িতে নেমন্তন্ন করে আনা।

—যদি বিনা নেমন্তন্নেই গিয়ে হাজির হই? মেঘনাদ মুখ টিপে বললো।

—সে তো বুঝবো আমার পরম ভাগ্য···দুর্জয়সিংহবাবুর কথা শেষ

হবার আগেই ট্রেনের হুইসেল বেজে উঠলো। ট্রেনটা চলতে শুরু করলো স্টেশন ছেড়ে।

দুর্জয়সিংহ চক্রবর্তীর শেষ চিৎকারটা শোনা গেল দূর থেকে—তাজা খবরে আপনার এই কাহিনীর মধ্যে অমার চরিত্রটা রাখতে ভুলবেন না মশাই··· !

আর কিছু শোনা গেল না। ট্রেন স্পীড নিতে শুরু করেছে।

—আশ্চর্য মানুষ যা হোক! এবার আমি সীটে হেলান দিয়ে বসে বললাম।

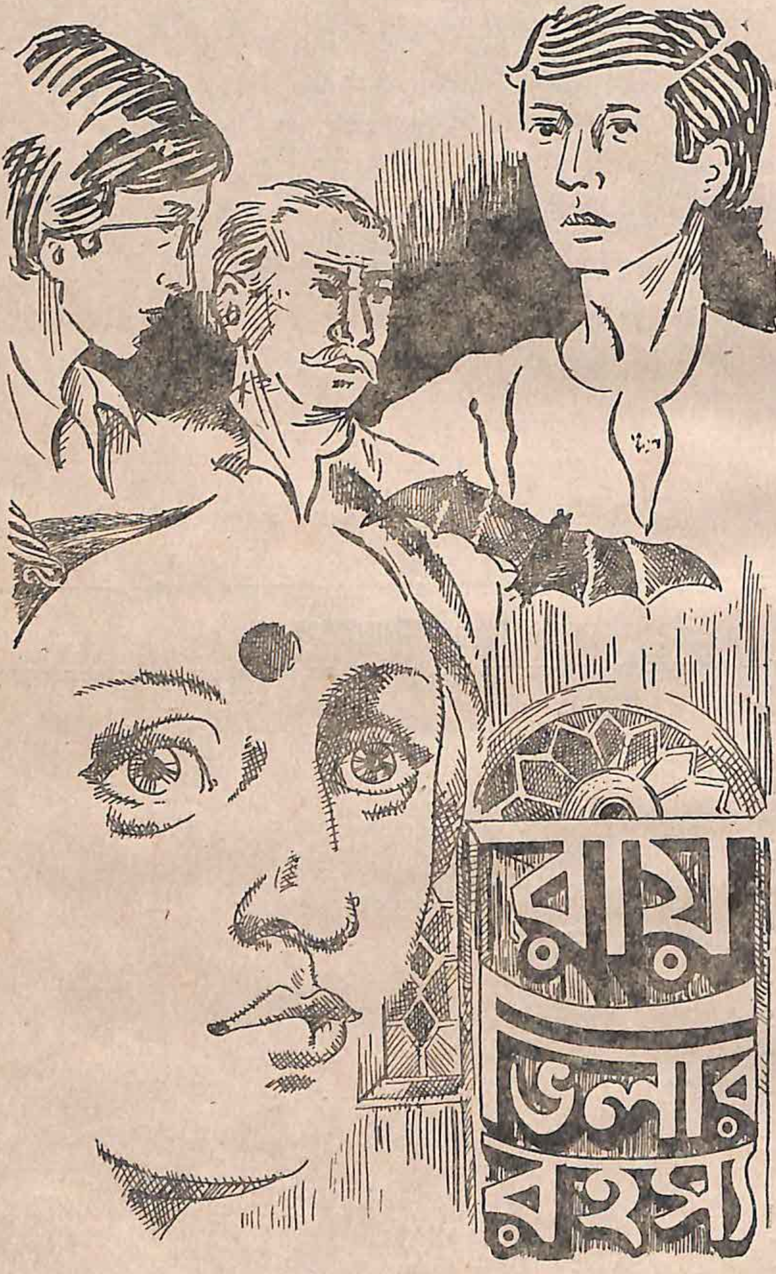
—মানুষটাকে আমারও ভাল লেগেছে রে। মেঘনাদ বললো—এমন বাগদা চিংড়ি খাওয়া রাক্ষুসে লোক এর আগে দেখেছিস কখনও ?

—না। একটুও না ভেবে আমি বললাম, এখন তো মনে হচ্ছে আপাততঃ উনিই একটি জীবন্ত চিংড়ি বিভীষিকা।

এবার মেঘনাদের হাসার পালা।

— শেষ —

রায় ভিলার রহস্য


রায়
ভিলার
রহস্য

এক

[পদার্পণ]

গম গম শব্দে ট্রেনটা এসে স্টেশনে ঢুকলো।

হঠাৎ যেন একটা খোঁচা খাওয়া সাপের মতোই ফোঁস করে উঠলো স্টেশনটা। তারা সারা শরীরে এখন ব্যস্ততা। চা গরম···সিঙাড়া··· কলার হাজার হাঁকাহাঁকি। লটবহর নিয়ে শুরু হল বেশ কিছু যাত্রীর যুগপৎ ওঠা আর নামা। কেউ আর এতটুকু অপেক্ষা করতে রাজী নয়। ট্রেন এখানে থামবে মাত্র কয়েক মিনিট।

এরই মধ্যে নেমে পড়লাম আমরা তিনজন। আমাদের সঙ্গে থাকার মধ্যে আছে মেঘনাদের হাতে শুধু এ্যাটাচি, আমার হাতে সুটকেশ আর বারিনবাবুর হাতে একটা হ্যাণ্ড বেডিং।

—সময়টা টুরিষ্ট সিজন তো। এসময় এখানে ভালই ভিড় হয়। বারিনবাবু বললেন।

সে অবশ্য এখানকার যাত্রীদের চেহারা দেখলেই বোঝা যায়। বেশির ভাগই হাওয়া বদলকারীর দল। কেউ আমাদের সঙ্গে ট্রেনে এসে নামলেন, কেউ ফিরছেন। কেউ কেউ আবার সকাল বেলা স্টেশনে বেড়াতেও এসেছেন। বোঝা গেল এঁদের মধ্যে রাশভারী কর্তা থেকে শুরু করে সপরিবারে ক্ষান্ত পিসির দল সব রকম মানুষই আছে। তবে বেশির ভাগই মধ্যবিত্ত বাঙালী। এসব জায়গায় এমন মানুষের ভিড়ই বেশি।

শিমূলতলার জল নাকি পেটের পক্ষে ভাল।

আমরা অবশ্য হাওয়া বদল করতে আসি নি। তবে এই সুযোগে সেটুকু লাভ যদি হয় মন্দ কি।

অবশ্য সবটাই নির্ভর করছে যে কাজে আমরা এসেছি সেই ঘটনার গতির ওপর—অর্থাৎ আমাদের গতি যদি দুর্গতিতে না পৌঁছয় তবেই।

স্টেশনের বাইরে পা দিতেই সর্বপ্রথম চোখে পড়লো চাল-ডাল-তেল মসলার এক বিরাট আড়ত। জমজমাট কেনা বেচা চলছে।

গদীতে বসে মাঝবয়সী এক ভদ্রলোক। পরনে ফাইন আদ্দির পাঞ্জাবী, ধুতি, রিমলেশ ফ্রেমের চশমা। কিন্তু চশমার কাঁচের মধ্যে যে দুটো চোখ রয়েছে দেখলেই বোঝা যায় তার দৃষ্টি খুবই তীক্ষ্ণ এবং অন্তর্ভেদী। গদিতে বসেই টাকা গোনার সঙ্গে সঙ্গেই সমান তালে দৃষ্টি রেখে চলেছেন প্রতিটি খদ্দেরের ওপর।

অন্যমনস্কতা ভাঙলো বারিনবাবুর কণ্ঠে। ভদ্রলোক আমার কানের কাছে মুখ এনে ফিস ফিস করে বললেন, উনিই রামপদ রায়।

—রামপদ রায়। মানে যার কথা আগে বলেছিলেন, সম্পর্কে আপনার ভাই?

আমার মুখ থেকে কথাটা শুনে বারিনবাবু এক অপরিসীম বিতৃষ্ণায় ঠোঁট বেঁকালেন। বললেন—এমন ভাই যেন পরম শত্তুরেরও না হয়। ওরা বাপ বেটা মিলে আমার বাবাকে কম হেনস্থা করে নি।

মেঘনাদ এতক্ষণ চুপচাপ ছিল। এসব কোন কথাই বোধ হয় ওর কানে ঢোকে নি। হঠাৎ বললো—আমরা কি এখন সোজাসুজি 'রায়-ভিলাতেই' যাব বারিনবাবু?

—যাবার পথে শুধু একবার শিউচরণজীর কাঠগোলাটা ঘুরে যাব।

—সেটা কতদূর?

—হাঁটা পথে মিনিট তিনেকের বেশি নয়।

দুই

[পূর্ব কথা]

কলকাতা থেকে শিমূলতলায় আমরা এসে পৌঁছেছি বিশেষ এক রহস্যের সূত্র সন্ধানে।

বারিনবাবু হলেন আমার সাংবাদিক-কাম-রহস্যভেদী বন্ধু মেঘনাদ ভরদ্বাজের অন্নদাতা 'তাজা খবর' পত্রিকার মালিক হরিসাধন-বাবুর আপন খুড়তুতো শালা। দিন পনেরো আগে ওঁর সঙ্গে মেঘনাদের আলাপ। ভদ্রলোকের বছর ৪০ বয়স। বর্তমানে এক অদ্ভুত সমস্যায় জর্জরিত।

বারিনবাবু মানুষটা আজ নেহাত ছা-পোষা মধ্যবিত্ত হলেও ওঁর পূর্ব-পুরুষেরা নাকি ছিলেন ডাকসাইটে জমিদার। সেই সুবাদে শিমূল-তলায় ওঁদের একটা বিশাল বাড়ি আছে। নাম—'রায়-ভিলা'।

এ ধরনের বেশ কিছু বাড়িই এককালের ধনী বাঙ্গালী সম্প্রদায় এসব অঞ্চলে তৈরি করে গেছেন এখানকার মনোরম জল-হাওয়ায় এসে মাঝে মধ্যে স্বাস্থ্য উদ্ধার করে যাওয়ার উদ্দেশ্যে। এখন সে সব বেশির ভাগ বাড়িই বেহাত কিংবা ধ্বংসপ্রায়। প্রায় তিন বিঘা জমির ওপর প্রস্তুত 'রায়-ভিলা' একশো বছরেরও বেশি পূর্বে তৈরি এমনই এক বাগান বাড়ি।

গত দশ বছর যাবৎ রায়-ভিলায় এক আশ্চর্য সমস্যা সৃষ্টি হয়েছে। তার আগে জীবনের প্রায় শেষ পনেরো বছর এখানে কাটিয়ে গেছেন বারিনবাবুর বাবা কৃষ্ণধন রায়। তখন কিন্তু কোন কিছু শোনা যায় নি

তাঁর কাছ থেকে। সে সময় বারিনবাবু নিজে এসেও বারকয়েক এখানে থেকে গেছেন—তখন অস্বাভাবিক কিছু দেখেন নি বা শোনেন নি। কিন্তু রায়-ভিলা বর্তমানে ভূতুড়ে অপবাদগ্রস্ত।

গত কয়েক বছর যাবৎই নাকি রাতের বেলা এই বিশাল ভবনটির ভেতর থেকে নানা অনৈসর্গিক কাণ্ডকারখানার ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছে। বাইরে থেকেই শোনা যায় গভীর রাতে বদ্ধ নির্জন পুরীর ভেতর থেকে ভেসে আসে ঘুঙুর সারেঙ্গির ধ্বনি, নারীকণ্ঠের করুণ কান্না অথবা মর্মভেদী মরণ আর্তনাদ! আজকাল সন্ধ্যের পর ভুলেও কেউ পা দিতে সাহস করে না ও বাড়ির আশেপাশে।

জনশ্রুতি আছে, প্রায় একশো বছর আগে রায়-ভিলার বর্তমান মালিক বারিন রায়ের প্রপিতামহ নরেন্দ্রনারায়ণ রায় যিনি স্বভাবে ছিলেন প্রচণ্ড বদমেজাজী এবং উচ্ছৃঙ্খল, এই রায়-ভিলার এক কক্ষে খুন করেছিলেন তাঁর সুন্দরী নর্তকী রুক্মিনী বাঈকে। রুক্মিনী বাঈএর আত্মা আজও নাকি নূপুর নিক্কণ তুলে ঘুরে বেড়ায় ভবনের বিশাল অলিন্দ আর ঘরগুলিতে। অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষায় ফুঁপিয়ে কাঁদে, আর্তনাদ করে। গভীর রাতে সে আর্তকণ্ঠ শোনা যায় বহু দূর থেকে।

আর এ কারণেই রায়-ভিলা এ এলাকার মানুষের কাছে অভিশপ্ত। এর বর্তমান মালিক বারিন রায় অনেক চেষ্টা করেও পারছেন না এই বিশাল বাড়িটাকে উপযুক্ত মূল্যে কোন ক্রেতার হাতে তুলে দিতে।

প্রথম দিকে দু'চারজন সাহসী লোক অবশ্য রায়-ভিলার জাঁকজমক আর গৌরবের কথা ভেবে বাড়িটা কেনার জন্যে এগিয়ে এসেছিল—কিন্তু কেনার আগে এখানে এসে দু'এক রাত কাটিয়েই পিঠটান দিয়েছে তারা। তাদের মুখেই শোনা গেছে রাতের রায়-ভিলা সত্যিই নাকি জীবন্ত হয়ে ওঠে। অশরীরী হাতছানি রাতের বাসিন্দাদের টেনে নিয়ে যায় ঘর থেকে ঘরে। শেষ পর্যন্ত তাদের জ্ঞান ফিরলে দেখে তারা শুয়ে আছে রায়-ভিলা থেকে দূরে কোন আবর্জনা স্তূপ কিংবা গাছের নীচে।

এমন কি বছর পাঁচেক আগে বারিনবাবুর নিজেরও একবার সে অভিজ্ঞতা হয়েছিল। যদিও বারিনবাবুকে অকারণে ভীতু অপবাদ মোটেই দেওয়া চলে না।

বারিনবাবুর মুখে সব কিছু শুনে মেঘনাদ প্রশ্ন করেছিল—এখন কি ও বাড়ি কেনার একজন খদ্দেরও খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না?

রামপদ রায় নামটা তখনই শুনেছিলাম বারিনবাবুর মুখে।

রামপদ রায় বারিনবাবুর বাবার খুড়তুতো ভাইয়ের ছেলে। সেই হিসেবে দূর সম্পর্কের ভাই বলা যায়। কিন্তু রামপদবাবুর বাবা নাকি রায় পরিবারের ত্যাজ্যপুত্র ছিলেন। সেই হিসেবে এই বংশের কোন বিষয় সম্পত্তির ওপরই ওদের কোন অধিকার নেই। তবু বিশেষ করে 'রায় ভিলা'র ওপর ওদের লোভ নাকি কোনদিন যায় নি। বেশ কয়েকবার বারিনবাবুর কাছে রামপদবাবু রায়-ভিলা সরাসরি কেনার ইচ্ছাও প্রকাশ করেছিলেন কিন্তু যেহেতু বারিনবাবুর বাবা জীবদ্দশায় কোনদিন চাননি যে এ বংশের কোন বিষয় সম্পত্তি ওদের করতলগত হয় সে কারণে রামপদবাবুর সে ইচ্ছায় বারিনবাবু কোনদিন কান দেন নি।

রামপদ রায় বহুকাল যাবৎই শিমূলতলায় বাস করছেন। ওখানে ওঁর চাল-ডালের বিরাট আড়ত।

—সব কিছু ছেড়ে রামপদ রায় হঠাৎ রায়-ভিলা কেনার জন্যে উৎসাহী হলেন কেন খোঁজ করেছেন, বিশেষতঃ যে বাড়ির এমন ভূতুড়ে বদনাম? প্রশ্নটা আমিই করেছিলাম।

বারিনবাবু উত্তরে বলেছেন, রামপদ একটা আস্ত ঘুঘু। মুখে অবশ্য বলে, আমার নামের মধ্যে আছে 'রাম' অতএব ভূতের বাবাও ঘেঁসবে না—কিন্তু ওর প্রকৃত মনোভাব কি বলতে পারি না।

এর দিন তিনেকের মধ্যেই বারিনবাবুকে সঙ্গে নিয়ে মেঘনাদ আর আমি দিল্লি-জনতায় উঠে বসেছি শিমূলতলার টিকিট কেটে।

এই সত্যি ভূতের গল্পে ভূতের ব্যাপারটা কতটা সত্যি সে ব্যাপারে একটা অনুসন্ধান চালালে মন্দ হয় না—অন্তত রথ দেখা কলা বেচা দুইই হতে পারে।

তিন

[শিউচরণ শর্মা]

কয়েক মিনিট হাঁটতেই শিউচরণজীর কাঠগোলায় এসে হাজির হলাম।

শিউচরণ শর্মার বছর ৫০ বয়স। লম্বা চওড়া চেহারা। এ এলাকার লোকেদের মধ্যে নাকি দারুন প্রতিপত্তি।

আমরা যখন কাঠগোলার সামনে এলাম শিউচরণজী হাঁক ডাক করে কর্মচারীদের কাঠচেরাই কাজের তদারক করছিলেন।

বারিনবাবুকে দেখেই শিউচরণ শর্মা আনন্দে হৈ চৈ করে উঠলেন, —আরে রায় সাহাব, আইয়ে আইয়ে। আমি আজই আপনার কথা ভাবছিলাম।

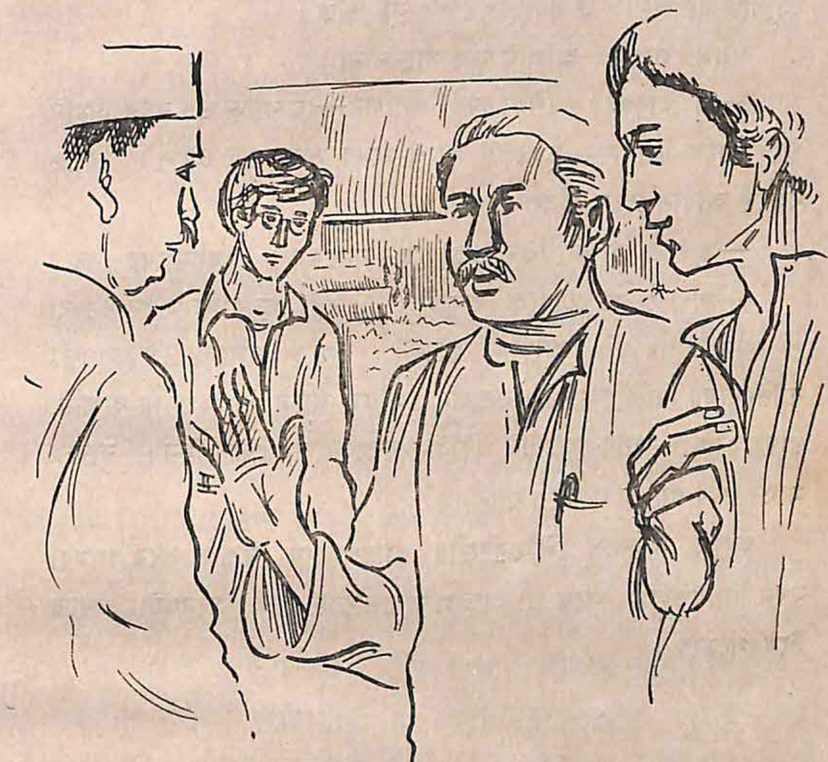
বারিনবাবু বললেন—ভেবেছিলাম আগে আপনাকে একটা চিঠি দেব কিন্তু তাড়াতাড়িতে হয়ে উঠলো না।

—হাঁ, তা দিলে ভালই হত রায়সাহাব। আপনাদের আসার সময়টা জানলে আমি নিজে ইস্টিশানে চলে যেতুম।

—তাতে অবশ্য কোন অসুবিধে হয় নি। এই বলে বারিনবাবু মেঘনাদ আর আমার সঙ্গে শিউচরণ শর্মার আলাপ করিয়ে দিলেন।

শিউচরণজীর চেহারাটা কঠিন হলেও মানুষটা অমায়িক। আমাদের খুব খাতির করে তাঁর গোলার ভেতরে নিয়ে গিয়ে আমাদের বসালেন। একজন লোককে ডেকে তক্ষুনি চা, পুরি, গরম জিলিপি আনার হুকুম করলেন। কিছুক্ষণের মধ্যেই চ্যাঙাড়ি ভর্তি সে সব খাবার

চলে এল। আমরাও আর দেরী করলাম না। সারা রাত ট্রেন জার্নির পর বিলক্ষণ খিদে পেয়েছিল। অতএব অচিরেই সব কিছু 'পেটস্থ' হয়ে গেল।



এরপর শিউচরণজীর সঙ্গে আমাদের আলাপের পালা শুরু হল।

শিউচরণজী কথায় কথায় বললেন, বেশ ভাল সময়ে এসেছেন বাবুজীরা। এটা চেঞ্জারদের সিজিন। কোথায় থাকবেন ঠিক করেছেন?

—হ্যাঁ, রায়-ভিলায় ভূতের গেষ্ট হয়ে। মেঘনাদ মুখ টিপে হেসে বললো।

—ভূতের গেষ্ট! শিউচরণজী প্রথমে মেঘনাদের রসিকতাটা বুঝতে না পেরে যখন আমতা আমতা করতে লাগলেন তখন মেঘনাদ শিমূল-

তলায় আসার উদ্দেশ্য অকপটেই জানাল—রায়-ভিলার ভূতের সাক্ষাত লাভ।

শুনে তো শিউচরণ শর্মা প্রাণ খুলে হেসে বললেন—এই তো মরদ কা বাত বাবুজী। ও সব ভূত প্রেত ঝুট ভক্কি।

আমি বললাম—আপনি ভূত মানেন না?

—না বাবুজী। শিউচরণজী বললেন—যে বাড়ি ভর বছর এমনি পড়ে থাকে সেখানে ঢুকলেই আগে মনের ভূত ঘাড়ে চাপে। বলতে বলতে আবার হেসে উঠলেন।

—তাহলে বাড়িটা কিনতে চাইছেন না কেন? মেঘনাদের প্রশ্ন।

—রুপিয়া কা ওয়াস্তে বাবুজী। এতনা বড় বাড়ি খরিদ করবো—এমন তাগদ কি আমার আছে? বলতে বলতে শিউচরণজী বারিনবাবুর দিকে তাকিয়ে বললেন, লেকিন আমি তো কতবার বলেছি, রায়সাহাব, ও বাড়ি আপনি বিক্রি করবেন না, রেখে দিন। বাবার মতো শেষ বয়সটা কাটিয়ে যাবেন।

আরও কিছুক্ষণ শিউচরণজীর কাঠগোলায় বিশ্রাম করে আমরা যখন রায়-ভিলার পথে পা বাড়ালাম ভোরের সূর্য অনেকটা ওপরে উঠে পড়েছে।

চার

[রায়-ভিলায় পদক্ষেপ]

সময়টা নভেম্বর মাস। এ সময় দলে দলে চেঞ্জার শিমূলতলায় এসে ভিড় জমায়। এখানকার ইউক্যালিপটাস, শাল-শিমূল, নানা গাছ-গাছালি ঘেরা লাল মাটির প্রকৃতি সত্যিই বড় সুন্দর!

রায়-ভিলার সামনে এসে আমরা মুগ্ধ হয়ে গেলাম। সত্যিই এ যেন কোন রাজপ্রাসাদ। প্রায় তিন একর জায়গা জুড়ে প্রাচীর ঘেরা এই বিশাল দোতলা বাড়িটা এক বিস্ময়।

বহুদিন অব্যবহার আর রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে জীর্ণতার দংশনও একেবারে নষ্ট করতে পারে নি রায়-ভিলার অতীত গৌরবের স্বাক্ষর।

লোহার গেট পেরিয়ে জংলা বাগান মাড়িয়ে আমরা পৌঁছলাম ভবনের সদর দরজার সামনে। সেখানে ঝুলছে এক বিরাট তালা। বহু দিন অব্যবহারে তালার গায়ে মরচের দাগ। বারিনবাবু পকেট থেকে চাবিটা বার করতেই মেঘনাদ বললো, ওটা আমায় দিন।

খুব সতর্ক ভঙ্গিতে তালা খুলে তালাটা হাতে নিয়ে নেড়ে-চেড়ে কি যেন দেখলো মেঘনাদ, তারপর বললো, চলুন ভেতরে ঢুকি।

রায়-ভিলার ভেতরে পা দিলাম আমরা।

সঙ্গে সঙ্গে যেন একরাশ নৈঃশব্দ ঝাঁপিয়ে পড়লো আমাদের ওপর।

চারদিক নিঃঝুম। এই দিনের বেলাতেও কোথাও কোন প্রাণীর সাড়া নেই। সারি সারি ঘর, চতুর্দিকে ময়লা আর ধুলোর স্তর। বাইরে থেকে খুব বেশি চোখে না পড়লেও ভেতরে ঢুকতেই বোঝা গেল

কালের জীর্ণতা দ্রুত গ্রাস করতে শুরু করেছে এই সুবিশাল ভবনটিকে। স্থানে স্থানে দেওয়ালের পলেস্তরা পড়েছে খসে। ছাদের আলসেতে গজিয়েছে বট-অশ্বত্থের চারা।

পায়ের সামনে দিয়ে সর সর করে কি একটা চলে গেল। সাপ ভেবে চমকে লাফিয়ে সরে গেলাম। না, সাপ নয়—একটা বিরাট কালো রঙের টিকটিকি। উঃ, কী বীভৎস চেহারা। মেঝে থেকে ওটা লাফ দিয়ে দেওয়ালে উঠে গেল।

বারিনবাবু বললেন—শেষ জীবনে বাবা যে ঘরটায় কাটিয়ে গেছেন, চলুন আমরা সেই ঘরেই ঢুকি।

ঘরটা একতলাতেই। ঘরে পা দিতেই ঘর ভর্তি মাকড়সার জালে জড়িয়ে পড়লাম।

সেই অস্বস্তিকর অবস্থা থেকে প্রাণপণে মুক্ত হবার চেষ্টা করছি, হঠাৎ মেঘনাদের কণ্ঠ শুনলাম,—অর্ণব, ভূত বা পেত্নীরা কখনো ধূম পান করে শুনেছিস ?

চমকে মেঘনাদের দিকে তাকিয়ে দেখি—ওর হাতে একটা পোড়া বিড়ি, দেখলেই বোঝা যায় খুব বেশিদিনের পুরনো নয়। এখনও ওর পাতা আর সুতোর রঙ বেশ তাজা।

মেঘনাদ বললো—এটা ঘরের মধ্যেই কুড়িয়ে পেলাম। অথচ এ বাড়িতে নাকি গত পাঁচ বছরে কোন লোক ঢোকে নি।

পাঁচ

[মেঘনাদের প্রাতঃভ্রমণ]

রায়-ভিলাতে প্রথম রাতটা আমাদের বেশ নিরুপদ্রবেই কেটে গেল। অনেক রাত পর্যন্ত জেগে থেকেও আমরা কোন ভৌতিক কান্না বা নাচ-গানের শব্দ পাই নি।

বারিনবাবু তো শেষ পর্যন্ত বলেই ফেললেন—মশাই, গোয়েন্দাকে যে ভূতেও ভয় করে এ যাত্রাতেই বোধ হয় তা প্রমাণ হয়ে যাবে। আমি এখানে কাউকে না জানালে কি হয় ভূত বোধ হয় আপনাদের পরিচয় ঠিক জেনে ফেলেছে।

যাই হোক, পরদিন যখন ঘুম ভাঙলো বেশ বেলা হয়ে গেছে। পাশে তাকিয়ে দেখি বারিনবাবু তখনও নাক ডাকাচ্ছেন—কিন্তু মেঘনাদ ঘরে নেই।

এই সাত সকালে উঠে কোথায় গেল ও ?

ঘর থেকে বেরিয়ে আশপাশটা যতদূর সম্ভব খুঁজলাম। কিন্তু মেঘনাদের টিকিও দেখা গেল না কোথাও।

এই দিনের আলোতেও রায়-ভিলা স্তব্ধ—নিঃঝুম ! একটা পাখি পর্যন্ত ডাকছে না কোথাও !

ঘরের মধ্যে ঢুকে বারিনবাবুকে ডেকে তুলে ব্যাপারটা জানাব কি না ভাবছি—শিস্ দিতে দিতে মেঘনাদ ঘরে ঢুকলো। ওর দু'চোখের দৃষ্টি কেমন উজ্জ্বল। এ লক্ষণ আমার চেনা। মেঘনাদ কোন কিছুর আভাস পেয়েছে।

বললাম—এত সকালে গিয়েছিলি কোথায় ?

—একটু প্রাতঃভ্রমণ সেরে এলাম। খুব নির্বিকার ভাবে জবাব দিল মেঘনাদ।

তারপর হঠাৎ পকেট থেকে একট লাল রঙের হেয়ার ক্লিপ বার করে বললো —দেখ তো অর্ণব, একশো বছর আগে নর্তকী-বাইজীরা এই রকম ক্লিপ দিয়ে চুল বাঁধতো কি না ?

এ সব কি বলছে মেঘনাদ !

এ তো দেখলেই বোঝা যায় লাল রঙের হাল ফ্যাসানের প্লাষ্টিকের হেয়ার ক্লিপ। তাছাড়া জিনিসটাও তো খুব পুরনো নয়। এখনও এর রঙের উজ্জ্বলতা পর্যন্ত বজায় রয়েছে।

বললাম—কোথায় পেয়েছিস এটা ?

—রায়-ভিলার অন্য একটা ঘরের মেঝেতে। সম্ভবতঃ রুক্মিনী বাঈএর অতৃপ্ত আত্মা নাচ গান করতে এসে ফেলে গেছে।

অবাক হয়ে তাকিয়ে দেখি মেঘনাদের চোখ দুটো কৌতুকে ঝকঝক করছে। হঠাৎ ও বারিনবাবুর দিকে তাকিয়ে বললো, আচ্ছা, এখানে কোন ওষুধের দোকান আছে ?

বারিনবাবু ততক্ষণে ঘুম ভেঙে উঠে বসেছেন। আমার আর মেঘনাদের কথোপকথন শুনছেন। শুনতে শুনতে ওঁর চোখ দুটো রসগোল্লার আকার ধারণ করেছে। মেঘনাদের প্রশ্নে থতমত খেয়ে জবাব দিলেন—হ্যাঁ, মেডিসিন সপ্ স্টেশনের কাছেই আছে একটা। কিন্তু কি ব্যাপার, হঠাৎ শরীর বিগড়ালো নাকি আপনার ?

মেঘনাদ বারিনবাবুর কথাটা বোধ হয় শুনেও না শোনার ভান করে বললো—চটপট তৈরী হয়ে নিন। ব্রেকফাষ্ট তো আমাদের স্টেশনে গিয়েই সারতে হবে।

ছয়

[চৌকিদার ছক্কুলাল]

এর আগেও লক্ষ্য করেছি মাঝে মাঝে মেঘনাদকে কেমন হেঁয়ালিতে পেয়ে বসে।

রায়-ভিলা থেকে বেরিয়ে স্টেশনের কাছাকাছি এসে কিছু না বলে সেই যে ও অন্যদিকে বাঁক নিয়েছে তারপর প্রায় পাক্কা দু'ঘণ্টা কেটে গেছে মেঘনাদের পাত্তা নেই।

অবশেষে শিউচরণজীর কাঠগোলায় চা-পুরি-জিলিপি সহযোগে আরও কিছুক্ষণ গল্প করে আমরা আবার রায়-ভিলাতেই ফিরে চললাম। কে জানে মেঘনাদ হয়তো এতক্ষণ সেখানেই ফিরে গেছে।

অনুমান আমাদের মিথ্যে হয় নি।

দূর থেকেই দেখতে পেলাম রায়-ভিলার গেটের ভেতর বিরাট জংলা বাগানটার মধ্যে মেঘনাদ কাদের সঙ্গে যেন কথা বলছে।

একজন বছর ৫০ বয়সী পুরুষ, অন্যজন নারী, দেখে তো স্থানীয় কোন গরীব লোক বলেই মনে হয়।

পুরুষটির চেহারা শুকনো, রসকসহীন, কোলকুঁজো। কিন্তু মেয়েটি একেবারেই বিপরীত। মেয়ে না বলে অবশ্য ওকে বউ বলাই উচিত। সিঁথিতে সিঁদুর রয়েছে। কিন্তু বয়স ২০/২১ এর বেশি মনে হয় না। চকচকে চেহারা। বেশ চটক আছে।

ওদের সম্পর্কটা কি অনুমান করার চেষ্টা করছি। বারিনবাবু বললেন—আরে ছক্কুলাল, সঙ্গে লছমীকেও নিয়ে এসেছে।

—ছক্কুলাল কে ?

—বাবার আমলে এ বাড়ির চৌকিদার ছিল। রায়-ভিলাতে

ভূতের উপদ্রব শুরু হবার পর ছক্কুলাল কাজ ছেড়ে পালিয়েছে। এখন স্টেশনের কাছে কোন হোটেলে নাকি কাজ করে। অত্যধিক গাঁজা খাওয়া ছাড়া লোকটার অন্য কোন দোষের কথা শুনিনি।

—আর লছমীটা কে?

—ওর বউ।

—বউ?

হ্যাঁ, দ্বিতীয় পক্ষের। প্রথম পক্ষেরটা মারা যাবার পর বছর দুই হল বিয়ে করেছে।

ততক্ষণে ওরাও আমাদের দেখতে পেয়েছে।

ছক্কুলাল তো বারিনবাবুকে দেখেই এগিয়ে এসে সেলাম করলো। তারপর একগাল হেসে বললো—রামপদবাবুর মুখে শুনলুম হুজুর এখানে এয়েছেন, তাই বহুকে নিয়ে এলাম হুজুরকে সেলাম দিতে।

—রামপদ! বারিনবাবু ভ্রূ কুঁচকে বললেন—রামপদ জানলো কি করে আমি শিমূলতলায় এসেছি। এখানে এসে তো এখনও অবধি ওর সঙ্গে দেখা করি নি।

ব্যাপারটা সত্যিই অবাক হবার মতো। রামপদবাবু অর্থাৎ বারিনবাবুর সেই দূর সম্পর্কের ভাইটি, তাঁকে তো বারিনবাবু এখানে আসার পর চোখের দেখাও দেন নি। তাহলে? ভদ্রলোক কি হাত গুণতে জানেন নাকি!

আরও কিছুক্ষণ বক্ বক্ করার পর গোটা দশেক টাকা বখ্‌শিস নিয়ে যাবার সময় ছক্কুলাল লম্বা সেলাম করে বলে গেল—আজ সন্ধ্যের আগেই ও আমাদের জন্যে বউএর হাতের রান্না মুর্গীর মাংস আর চাপাটি বানিয়ে যাবে। পুরনো মালিকের এটুকু সেবা সে করতে চায়।

যাবার সময় ছক্কুলালের বউও আমাদের সকলকে হেঁট হয়ে সেলাম করে গেল।

অতি ভক্তি চোরের লক্ষণ নয় তো!

সাত

[মেঘনাদের হেঁয়ালি]

সে দুপুরটা আমাদের গল্প গুজব করে তাস পিটেই কেটে গেল। অন্য সময় মেঘনাদ তাস খেলাটা একেবারেই পছন্দ করে না, কিন্তু এখন আর অন্য কিছু করারও নেই।

ঠিক কাঁটায় কাঁটায় চারটে বাজতেই মেঘনাদ উঠে দাঁড়াল। বললো, তোরা খেলা চালিয়ে যা অর্ণব, আমি একটু ঘুরে আসি।

—কোথায় যাবি ?

—একটা ছোট্ট কাজ সারতে।

—এখানে আর কি কাজ, আমি বললাম, সঙ্গে যাব ?

দরকার নেই। তোরা বরং ঘরেই থাক।

বলে মেঘনাদ বেরিয়ে গেল। বারিনবাবুও অবাক হয়েছেন। কিন্তু আমি তো মেঘনাদকে চিনি। এখন পীড়াপীড়ি করেও কোন লাভ হবে না। তবে ও যে সান্ধ্য ভ্রমণে বেরোয় নি—একথা হলফ করে বলতে পারি।

মেঘনাদ ফিরলো সন্ধ্যে উতরে যাবার পর।

ওর পেছনে একটা বড় ডেকচি মাথায় ছক্কুলাল আর তার দ্বিতীয় পক্ষের বউ লছমী।

বারিনবাবু হেসে বললেন, আপনি কি মশাই এদের একেবারে ঘর থেকে রাঁধিয়ে নিয়ে এলেন নাকি ? এই দরকারেই বেরিয়েছিলেন বুঝি ?

মেঘনাদ হাসলো। কোন কথা বললো না।



ছক্কুলাল বললো—না হুজুর, এনার সঙ্গে রাস্তায় মোলাকাৎ হয়েছে। রাত নামবার আগেই জলদি চলে এলুম।

লছমী ততক্ষণে ডেকচি নামিয়ে নিয়েছে।

ডেকচির মধ্যে পরিমাণ মত মুর্গীর মাংস, চাপাটি, পিঁয়াজ।

লছমী সেগুলি ঘরের এক কোনে গুছিয়ে রাখতে রাখতে ওর স্বভাবসিদ্ধ হাসি হেসে বললো, বেশি দেরী করবেন না বাবুজিরা, মাংস গরম, স্বাদ গরম, মাংস ঠাণ্ডা, স্বাদ ভি ঠাণ্ডা। বলতে বলতে জোরে হেসে উঠলো।

আমি লক্ষ্য করছিলাম ছক্কুলালের এই বউটিকে। লছমীর বয়স কুড়ি-বাইশের বেশি হবে না। কথায় বার্তায় চাউনীতে সর্বদাই কী এক চাঞ্চল্য। সাজগোজেরও বেশ বাহার আছে। কথায় কথায় হেসে উঠছে। কিন্তু এমন একটা মেয়ে ওই গাঁজাখোর বুড়ো ছক্কুলালের সঙ্গে ঘর করে কি সুখী?

বারিনবাবুও বোধ হয় আমার মতই কিছু ভেবেছেন। ভারিক্কি কণ্ঠে বললেন, হ্যাঁরে ছক্কু, নেশা-টেশাগুলো একটু কমিয়েছিস? এসব নিয়ে আজকাল তোদের ঝগড়াঝাঁটি হয় না তো?

ছক্কুলাল কিছু বলার আগেই লছমী ঝামরে উঠলো, ও মরদ কুনদিন বদলাবে না হুজুর। আগে রাতে গাঁজা টানতো, এখন দিনে ভি ধরেছে।

—সে কি রে?

—তবে আর বলছি কি হুজুর। হোটেল মালিক দু দুবার ওকে হোটেলের নকরি সে তাড়িয়ে দিয়েছে তারপর আমি মালিকের হাতে পায়ে ধরে···

এবার ফুঁসে উঠলো ছক্কুলাল—থাম তু, আজকাল তুর রংঢং বড় বেড়েছে লছমী। আমাকে তু বোকা ভাবিস না? আমি সব টের পাই—

এবার দু চোখ জ্বল জ্বল করে উঠলো লছমীর, বললো—কি টের

পাস তুই, রাতভর দিনভর গাঁজা খেয়ে টং হয়ে পড়ে থাকিস। কী আমার মরদ রে···

অকস্মাৎ ছক্কুলাল আর লছমীর মধ্যে যে এমন একটা বিশ্রী কলহ ধুঁইয়ে উঠছে আমি ভাবতে পারি নি। মেঘনাদ কিন্তু দেখলাম ওদের ঝগড়াটা বেশ উপভোগই করছে। বারিনবাবুও বোধ হয় কি বলবেন—ভেবে পাচ্ছেন না।

প্রসঙ্গটা ঘুরিয়ে দেবার জন্যেই বললুম, ছক্কুলাল তুমি থাক কোথায় ?

—এখান থেকে পাঁচ মিনিটের রাস্তা বাবুজি। আমার একটা ছোট ঝুপড়ি আছে।

ওদের বিদায় দেবার আগে আবার গোটা দশেক টাকা বকশিস দিলেন বারিনবাবু। খুব খুশি হয়ে সেলাম করে ছক্কুলাল বললো পরদিন সকালে সে আবার আসবে। আমরা যে কদিন থাকবো আমাদের দুবেলা খাওয়ার ব্যবস্থাটা লছমীই করে দিয়ে যাবে।

ছক্কুলাল ঘর ছেড়ে বেরিয়ে যাচ্ছিল। মেঘনাদ হঠাৎ পিছু ডাকলো —ছক্কুলাল।

ছক্কুলাল থমকে দাঁড়াল। বললো,—কিছু বলবেন বাবুজী ?

—হ্যাঁ, একটা কথা জিগ্যেস করি। তুমি বিশ্বাস কর রায়-ভিলাতে ভূত আছে ?

আমি স্পষ্ট দেখলাম ছক্কুলালের চোখের দৃষ্টিটা কেমন বদলে যাচ্ছে—সে কি ভয়ে ? ঘনায়মান অন্ধকারের ছায়ায় লছমীর মুখটা এখন আর স্পষ্ট নয়। কয়েক মুহূর্ত থমকে থেকে কি যেন বলতে গেল ছক্কুলাল—

কিন্তু তার আগেই কাছে পিঠে কোথায় একটা প্যাঁচা ডেকে উঠলো বীভৎস ভাবে—ভুত-ভুত-ভুতুম···!

আমরা সবাই চমকে উঠলাম। অজান্তেই বুকের ভেতরটা কেঁপে উঠলো।

আর ছক্কুলাল প্রায় সঙ্গে সঙ্গে লছমীর হাত ধরে হুদ্দাড় করে ছুটে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে মেঘনাদের কথার কোন জবাব না দিয়েই।

ছক্কুলাল ভয় পেয়েছে।

এই মুহূর্তে পরিস্থিতিটা হঠাৎ কেমন থমথমে হয়ে গেছে। বারিনবাবুর দু চোখেও শঙ্কা।

কয়েক সেকেণ্ড এই ভাবেই কাটলো, তাপর হেসে উঠলো মেঘনাদ। হাসতে হাসতেই হেঁয়ালি করে ছড়া কাটলো :

বন থেকে বেরুলো ভূত্
ভূতগিরিতে নেইকো খুঁৎ !

আমি আর বারিনবাবু শুধু ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে রইলাম মেঘনাদের দিকে। কি বলতে চায় ও ?

আট

[মেঘনাদের 'বজ্র-পরিপাক' ক্রিয়া]

মুর্গীর ঠ্যাং চিবুতে চিবুতে মেঘনাদ নিমীলিত চক্ষে বললো—লছমীবাঈ শুধু রসিকা রমণীই নয়, রন্ধনে রীতিমত দ্রৌপদী। মুর্গীর স্বাদটা অন্তত দিন কয়েক জিভে লেগে থাকবে।

ইতিমধ্যে সন্ধ্যেবেলাকার সেই ছোট্ট অপ্রীতিকর পরিস্থিতিটা আমরা কাটিয়ে উঠেছি। তারপর রাত আর বাড়তে দিইনি। ঘরের পুরনো ড্রেসিং টেবিলটার ওপর খাওয়ার প্লেট সাজিয়ে বসে গেছি আমরা তিনজন। গোটা তিনেক বড় বড় মোমবাতি জ্বলছে। ঘরের অন্ধকার তাতেই অনেকটা দূর হয়েছে।

আমরা এখন যাকে বলে কব্‌জি ডুবিয়ে মুর্গীর মাংস আর চাপাটি খেয়ে চলেছি।

সত্যি! বেশ রেঁধেছে ছক্কুলালের দ্বিতীয় পক্ষের বউটি।

বারিনবাবু সশব্দে একটা উদ্গার তুলে বললেন—যাই বলুন মশাই, পূর্বপুরুষের জমিদারী প্রতাপের স্মৃতির অবশেষটুকু আজ আমাদের কাজে লাগলো। ঘরে বসে এমন অযাচিত ভোজের কথা ভাবা যায়?

বুঝলাম পুরনো আভিজাত্য গর্বের তলানি আজ সরকারী আপিসের দশটা পাঁচটা কলম পেষার পরও বারিনবাবুর রক্ত থেকে একেবারে যায় নি।

কিন্তু রায়-ভিলার প্রাক্তন চৌকিদার হঠাৎ যে নিজে থেকে এমন পরিতৃপ্ত আহার যুগিয়ে চলেছে তা কি সত্যিই পুরনো প্রভু বংশের

প্রতি কর্তব্য বোধে, নিছক বকশিসের লোভে—না কি অন্য কোন উদ্দেশ্য আছে এর পেছনে ?

—আজকের রাতটা অমাবস্যা, ভালয় ভালয় কাটলে হয়। বারিনবাবুর কণ্ঠস্বরে আমার অন্যমনস্কতা ভাঙলো।

মেঘনাদের খাওয়া এতক্ষণে শেষ হয়ে গেছে। প্লেটটা ঘরের কোনে সরিয়ে রেখে মগ থেকে জল নিয়ে ঘরের বাইরে থেকে হাত মুখ ধুয়ে-টুয়ে রুমালে মুখ মুছতে মুছতে ঘরে ঢুকে মেঘনাদ বললো, মনে হচ্ছে আজ রাতে আমাদের ভূত আরাধনা বিফলে যাবে না।

—তার মানে ? বারিনবাবু চমকে তাকালেন মেঘনাদের দিকে।

মেঘনাদ বারিনবাবুর চোখে চোখ রেখে এবার জিগ্যেস করলো, আচ্ছা আপনার মনে পড়ে, গত পাঁচ বছর আগে এ বাড়িতে রাত কাটাতে এসে ভৌতিক ইসারা অনুসরণ করে জ্ঞান হারাবার ঠিক আগের মুহূর্তে কি ঘটেছিল ?

—মানেটা বুঝলাম না। বারিনবাবু বিষম খেয়ে বললেন।

—অর্থাৎ আমার প্রশ্ন সেবার আপনার জ্ঞান হারাবার প্রকৃত কারণটা কি ছিল, শুধুই ভয় না অন্য কিছু ? ঠিক করে ভেবে বলুন।

একটু ভাবলেন বারিনবাবু, তারপর বললেন—ঠিক সেই মুহূর্তের কথাটা হুবহু মনে পড়ছে না মশাই। তবে এটুকু বলতে পারি, নারী-কণ্ঠের কান্না, নূপুরের নিক্কণ, গোঙানী এসব আমি নিজের কানে শুনেছি। সমস্ত বাড়ির মধ্যে আমায় যেন তাড়িয়ে নিয়ে বেড়িয়েছিল। অবশেষে কোন একটা ঘরে ঢুকে অজ্ঞান হয়ে পড়ি। বলতে বলতে একটু থেমে বারিনবাবু বললেন, আপনাকে তো আগেই বলেছি মেঘনাদবাবু, আরও কয়েকজনেরও এ বাড়িতে রাত কাটাতে এসে একই অভিজ্ঞতা হয়েছিল।

—রায়-ভিলার ভূত বড় রসিক। আপন মনেই বিড় বিড় করলো মেঘনাদ।

কিন্তু ওকে কিছু জিগ্যেস করার আর অবকাশ পেলাম না।

তার আগেই পুরনো পালঙ্কের মাঝখানটিতে দু হাঁটু পেছন দিকে ভাঁজ করে বুক চিতিয়ে বজ্রাসনের ভঙ্গিতে বসে পড়েছে।

ইদানীং খাওয়া দাওয়ার পর এ আসনটা নিয়মিতই করতে শুরু করেছে মেঘনাদ। বজ্রাসন নাকি পরিপাক ক্রিয়ায় খুবই কাজে লাগে। বিশেষ করে আজকের গুরুপাকের পর তো বিশেষ কোন 'বজ্র-পরিপাক' ক্রিয়ারই দরকার।

অতএব এখন আর মেঘনাদের সঙ্গে কথা বলে লাভ নেই।

নয়

[ভাবনার গোলকধাঁধা]

মেঘনাদের কথা যে অক্ষরে অক্ষরে ফলে যাবে ঘুমোবার আগের মুহূর্ত পর্যন্ত ভাবতে পারি নি।

সেই রাতেই মীমাংসা হয়ে গেল রায়-ভিলার রহস্য।

তা যেমন চমকপ্রদ তেমনি শিহরণ জাগান।

খাওয়া দাওয়া সেরে রাত দশটার মধ্যে শুয়েই পড়েছিলাম আমরা।

বারিনবাবু হাতে একটা বিদেশী থ্রিলার নিয়ে কিছুক্ষণ জেগে থাকার চেষ্টা করে অবশেষে কখন এক সময় ঘুমিয়ে পড়েছেন। ওঁর বুকের কাছে এখনও সে বই আলগা ভাবে ধরা রয়েছে। বইএর মলাটের ছবিটা বীভৎস—একটা মুখোস পরা লোক দু হাতে গলা টিপে খুন করছে অন্য একটা লোককে।

মেঘনাদকে লক্ষ্য করছিলাম। ওর হাতে সেই হেয়ার ক্লিপটা যেটা নাকি রায়-ভিলারই একটা ঘরে মেঘনাদ কুড়িয়ে পেয়েছে। অনেকক্ষণ যাবৎ ওটা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখতে দেখতে কি ভাবছিল কে জানে। তারপর ওর অবস্থাও হয়েছে বারিনবাবুরই মতো।

একমাত্র ঘুম নেই আমার দু চোখে।

এক অসহ আচ্ছন্নতার মধ্যে যেন সময় কাটছে আমার।

চোখের সামনে কুলুঙ্গির ওপর মোমবাতিটা জ্বলতে জ্বলতে অনেকটা কমে এসেছে। মাঝে মাঝে হাওয়ায় কেঁপে উঠছে মোম-বাতির শিখা। সেই টিমটিমে আলোয় ঘরের সব কিছু যেন আরও রহস্যময় হয়ে উঠেছে।

বাইরে ঝাঁ ঝাঁ রাত্তির। নিঃশব্দ। একটা পাতা ঝরার শব্দ পর্যন্ত ভেসে আসছে না।

কটা হল? রেডিয়াম দেওয়া হাতঘড়ির দিকে তাকালাম। দেখতে অসুবিধে হল না। রাত এগারটা। কিন্তু ঘড়ির কাঁটা যেন সরতেই চায় না—তবে কি আজকের রাতটা স্থির হয়ে থাকবে চিরকালের জন্যে!

বুকের মধ্যে হৃদপিণ্ডের পেণ্ডুলামটা আজ বড় বেশি শব্দ করে বেজে চলেছে।

নিদ্রালু আচ্ছন্নতায় মোমবাতির মৃদু আলোর কম্পন মনের মধ্যেও যেন ভাবনার তরঙ্গ সৃষ্টি করে চলেছে।

আমি শুয়ে আছি এমন একটা ঘরে যাকে ঘিরে গত এক শতাব্দীতে সৃষ্টি হয়েছে অনেক ইতিহাস।

এই রায়-ভিলার আদি মালিক নরেন্দ্রনারায়ণের হাতে নাকি খুন হয়েছিলেন নর্তকী রুক্মিনী বাঈ। তারপর তার দেহটাকে নিশ্চয়ই এই বাড়ির কোন গোপন অংশে কবরস্থ করা হয়েছিল। এ কথা কেউ না বলে দিলেও অনুমান করতে অসুবিধে হয় না—কারণ ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি গত একশো বছরেরও বেশিকাল যাবৎ অনেক তথাকথিত অভিজাত সৌধের চার দেয়ালের গোপনে জমা রয়েছে।

রুক্মিনী বাঈএর আত্মা নাকি আজও ঘুরে বেড়ায় রায়-ভিলার আনাচে কানাচে—নূপুরের নিক্কণ তুলে কিংবা বুক ভরা কান্নায় রাতের বাতাসকে ভারী করে।

সত্যিই কি তাই?

রুক্মিনী বাঈএর আত্মার আজও মুক্তি ঘটে নি—তাই তার এই হাহাকার?

আর সে কারণেই নাকি আজও কেউ রায়-ভিলায় রাত কাটাতে পারে না।

গত কয়েক বছরে রায়-ভিলায় কোন মানুষ ঢুকতে সাহস পায়নি।

কিন্তু একথা যদি সত্য হয় তাহলে প্রথম দিনই এই ঘরে ঢুকে মেঘনাদ বিড়ির টুকরো খুঁজে পেল কি করে? হেয়ার ক্লিপেরই বা রহস্য কি?

প্রেতাত্মা কি জীবিত কালের অভ্যাস ছাড়তে পারে না!

কিন্তু হেয়ার ক্লিপটা খুবই আধুনিক ডিজাইনের এবং দেখলেই বোঝা যায় সেটা খুব বেশিদিন এখানে পড়ে নেই।

সব ভাবনা কেমন যেন জট পাকিয়ে যাচ্ছে।

মোমবাতির ক্ষীণ কাঁপা আলোয় সারা ঘরটা আর একবার তাকিয়ে দেখলাম।

এই ঘরেতেই জীবনের শেষ দিনগুলি অতিবাহিত করে গেছেন কৃষ্ণধন রায়। বছর দশেক আগে তিনি মারা যাবার পর থেকেই এ ঘরে নাকি অন্য কেউ স্থায়ী ভাবে বাস করতে পারে নি। কিন্তু সেই সব পুরনো আসবাবপত্তর প্রায় সবই থেকে গেছে। সম্ভবতঃ রায়-ভিলার নিদারুণ ভৌতিক অপবাদের জন্যেই চোরও এ বাড়িতে ঢুকে কিছু হাতিয়ে নিয়ে যেতে সাহস পায় নি।

—টক্···টক্···টক্···!

চমকে তাকালাম।

আমাদের পালঙ্কটার ঠিক পাশেই দেয়ালের গায়ে গতকাল দেখা সেই পেটমোটা কালো টিকটিকিটা সরাসরি ঘাড় তুলে তাকিয়ে রয়েছে। শব্দটা ওই করলো।

ওর চোখে চোখ রাখতেই বুকের মধ্যে এক আলাদা অনুভূতি টের পেলাম। টিকটিকিটার লাল দু চোখে কেমন অশুভ দৃষ্টি। মাঝে মাঝে জিভটা বার করে আবার ঢুকিয়ে নিচ্ছে মুখের মধ্যে।

—টক্···টক্···টক্···!

আবার ডেকে উঠলো সরীসৃপটা।

নিঃশব্দ অন্ধ নিশীথে রায়-ভিলার এই অভিশপ্ত ঘরে কোন অশুভ সংকেত জানাতে চায় সে?

দশ

[ক্ষুধিত অতীত]

দেয়ালে দেয়ালে কারুকার্য। মাথার ওপর ঝাড় লণ্ঠনের হাজার আলোর রোশনাই। দরজায় দরজায় ঝুলছে দামী মখমলের পর্দা। দেয়ালে বড় বড় অয়েল পেন্টিং—সেখানে যে সব পুরুষের ছবি তাদের প্রত্যেকেরই পোশাক আর ভঙ্গিতে আভিজাত্য এবং অর্থের অহংকার।

মাটিতে পাতা শুভ্র ফরাস।

মাঝখানে তবলা সারেঙ্গি আর হারমোনিয়ামের সুর উঠেছে। তালে তালে নেচে চলেছে এক সুন্দরী নর্তকী। সে নেচে চলেছে ঘুঙুরের আওয়াজ তুলে দ্রুত ছন্দে।

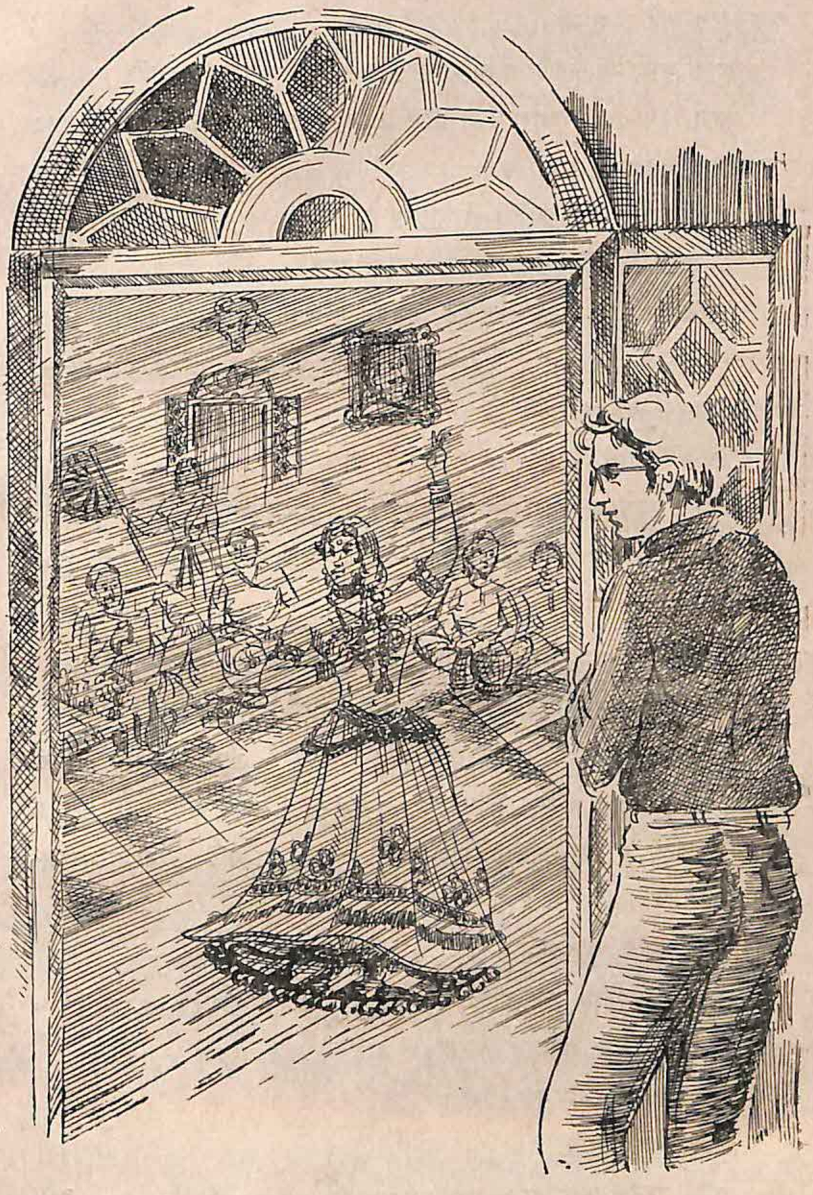
ঘরের কোনে এক নক্সাকাটা তাকিয়ায় হেলান দিয়ে বসে এক বিরাটবপু পুরুষ। পরনে চুনট করা ধুতি। ফিনফিনে পাঞ্জাবী। গলায় সোনার হার। হাতে ধরা পানপাত্র। পাশে দাঁড়িয়ে একজন দাসী। মাঝে মাঝে সে পানপাত্রে ঢেলে দিচ্ছে সুরা। একটু একটু করে সে পানপাত্রে চুমুক দিচ্ছে সেই বিরাট পুরুষ।

কিন্তু ও কি অদ্ভুত ক্রুরতায় চকচক করছে ওই মানুষটার দু চোখের চাউনি! নেশায় আরক্তিম দুটি চোখ। মাঝে মাঝে জিভ দিয়ে লেহন করে নিচ্ছে নিচেকার ঠোঁট।

আমি দাঁড়িয়ে আছি ঘরের প্রবেশ দরজার ঠিক পাশটিতে।

এ কোথায় হাজির হলাম আমি !!

মেঘনাদ, বারিনবাবু—ওরা কোথায় গেল ?



এরাই বা কারা ?

পেছন ফিরে তাকালাম। সেদিকে ঘুটঘুটে অন্ধকার। সে অন্ধকারে দৃষ্টি চলে না।

অথচ সামনের ঘরটিতে জ্বলে রয়েছে হাজার আলোর দ্যুতি।

তবে কি কোন আশ্চর্য জাত্নতে এসে হাজির হয়েছি অন্ধ অতীতের কোন ফেলে আসা অধ্যায়ে ?

এ কি আর এক ক্ষুধিত পাষাণের রাত ?

—রুক্মিনী বাঈ, নাচো, নাচো সারা রাত।

তাকিয়ায় হেলান দেওয়া ওই বিরাটবপু পুরুষটি আকণ্ঠ নেশার মধ্যে হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠলো। নেশাগ্রস্ত কোন মানুষের চোখে এত খলতা আমি আগে কখনও দেখি নি।

'রুক্মিনী বাঈ' নামটা কোথায় যেন শুনেছি !

মনে পড়েছে—বারিনবাবুর মুখে। রায়-ভিলায় যে নর্তকীটি জমিদার নরেন্দ্রনারায়ণের হাতে খুন হয়েছিল, তার নাম ছিল রুক্মিনী বাঈ।

মাথার ভেতর হাজার মৌমাছি গুনগুন করছে।

নর্তকীর দিকে তাকালাম। দেখেই বোঝা যায় সে বড় পরিশ্রান্ত। কতক্ষণ ধরে এক ভাবে নেচে চলেছে কে জানে! শ্রান্তির ঘামে ভিজে ধুয়ে যাচ্ছে তার চন্দন কুমকুমের প্রসাধন। ক্ষণে ক্ষণে খসে পড়ছে ওড়না, কেটে যাচ্ছে নৃত্যের তাল, সঙ্গী তবলা, সারেঙ্গি, হারমোনিয়াম-বাদকরাও পরিশ্রান্ত। সে তাদের ভঙ্গিতেই পরিস্ফুট।

কিন্তু এ কি আশ্চর্য !

নর্তকীর মাথায় ওই হালফ্যাসানের হেয়ার ক্লিপটা কে এঁটে দিল ? ওটাই না মেঘনাদ কুড়িয়ে পেয়েছিল রায়-ভিলার ঘরে ?

ওর মুখটাও যেন বড় চেনা !

কোথায় দেখেছি !

ওই পানপাতার মতো মুখ, চঞ্চল ত্নটি চোখের দৃষ্টি, চিবুকের নীচে

ছোট্ট একটা তিল !

হঠাৎই মনে পড়লো—

রায়-ভিলার প্রাক্তন চৌকিদার ছক্কুলালের দ্বিতীয় পক্ষের বউ—লছমী। নিজের হাতে মুরগীর মাংস রেঁধে খাইয়েছে ও আমায়, মেঘনাদ আর বারিনবাবুকে ॥

কিন্তু রুক্মিনী বাঈ-এর মুখটা হুবহু লছমীর মতো হল কি করে ? আর কারুকার্যময় তাকিয়াটায় হেলান দিয়ে বসে বিশাল বপু নিষ্ঠুর মানুষটা—ওই কি জমিদার নরেন্দ্রনারায়ণ, বারিনবাবুর পূর্বপুরুষ ?

চেতনায় সব কিছু কেমন ধোঁয়াটে মনে হচ্ছে···রুক্মিনী বাঈ···নরেন্দ্রনারায়ণ···লছমী···বারিনবাবু···মেঘনাদ··· !

নর্তকী নাচতে নাচতে থেমে গেল···ক্লান্তিতে ভেঙ্গে পড়ছে ওর শরীর !

—রুক্মিনী বাঈ নাচো—নেচে যাও, আজকের রাত এখনও অনেক বাকি।

ওকে ওভাবে নাচিয়ে চলেছে কেন—কোন নিষ্ঠুর রসিকতায় ?

—মাফি করবেন বাবুসাহাব। এবার একটু বিশ্রাম চাই।

হামার বাজনাদারেরা ভি বহুত পরিশানা হয়ে গেছে।

—বিশ্রাম ! হা হা করে হেসে উঠলো সেই বিশাল চেহারার পুরুষ। তারপর ঢুলু ঢুলু চোখে তাকিয়ে বললো—তেমন কথা তো ছিল না রুক্মিনী বাঈ। সেবার ঘুঘুডাঙার বাবুদের টাকা নিয়ে আমার মুজরো ফিরিয়ে দিয়েছিলে। এবার তাই তিনগুণ টাকা গুনে দিয়ে নিয়ে এসেছি। শর্ত আছে আজকের রাতটা তুমি আমার নাচঘরেই নাচবে।

—বাবুসাহাব, মুজরো করতে যখন এসেছি জরুর নাচবো সারা রাত। লেকিন থোড়া বিশ্রাম তো কভি কভি মিলবে। নর্তকী শ্রান্ত, ক্লান্ত স্বরে বলে।

—বিশ্রাম, হ্যাঁ, মিলবে বৈকি। নরেন্দ্রনারায়ণ ঘুঘুডাঙার বাবুদের চেয়ে অনেক বেশি আপ্যায়ন করতে জানে বাঈসাহেবা। বলতে বলতে

নর্তকীর দিকে কেমন বাঁকা চোখে তাকিয়ে হাসে সেই পুরুষটি তারপর হঠাৎ হাতে দু বার তালি বাজায়।

এতক্ষণ চোখে পড়ে নি। ঘরের কোনে আর একজন দাসী অপেক্ষা করছিল। তার হাতে রুপোর ছোট্ট থালার ওপর মুখ ঢাকা রুপোর গ্লাস। সংকেত শুনে সে এগিয়ে এল।

—এই মিষ্টি শরবত পান করে বিশ্রাম নাও। সব ব্যবস্থাই করে রেখেছি আমি।

সত্যিই বড় তৃষ্ণার্ত ছিল নর্তকী। তাই শরবতের গ্লাসটা ঠোঁটের সামনে ধরে এক নিঃশ্বাসে সবটা চুমুক দিয়ে পান করে নিল।

ততক্ষণ নির্ণিমেষ দৃষ্টিতে নর্তকীর দিকে তাকিয়ে আছে সেই পুরুষ। তার চোখের দৃষ্টি এই মুহূর্তে কোন বিষাক্ত সাপের চেয়েও ক্রূর।

এ কি! শরবত পানের সঙ্গে সঙ্গে নর্তকী অমন টলতে শুরু করেছে কেন? ওর হাত থেকে খসে পড়েছে রুপোর গ্লাস। ও কি অসুস্থ বোধ করছে? কেন? তবে কি অন্য কিছু মেশান ছিল শরবতের সঙ্গে?

—আঃ···আঃ···আহ্···!

অস্ফুট গোঙানীর সঙ্গে নর্তকী আছড়ে পড়লো নাচঘরের মেঝেতে। শরীরটা ওর কাঁপতে লাগলো থর থর করে। ছুটে এল ওর সঙ্গী বাজনাদারেরা।

একই ভঙ্গিতে তখনও অপলক তাকিয়ে রয়েছে সেই অভিজাত পুরুষটি। তারপর ধীরে ধীরে ফুটে উঠতে থাকে তার ঠোঁটে বিদ্রূপের বঙ্কিম রেখা। সে হাসতে শুরু করে। তার হাসির ফোয়ারা ক্রমে বিকট অট্টহাসির রূপ নেয়। হাসতে হাসতেই চিৎকার করে ওঠে—রুক্মিনী বাঈ, তোমার দেমাক আমি শেষ করে দিলাম। ঘুঘুডাঙার বাবুরা আর তোমায় আমার হাত থেকে কেড়ে নিয়ে যেতে পারবে না মুজরো করতে। তোমার শেষ মুজরো এই রায়-ভিলার নাচঘরেই হয়ে

রইলো। এখন তুমি বিশ্রাম নাও রুক্মিনী বাঈ, রায়-ভিলার নাচঘরে যুগ যুগ ধরে বিশ্রাম নাও।

তার ভয়ঙ্কর অট্টহাসি ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হয়ে চলে নাচঘরের চার দেয়ালে।

আমার পা দুটো কে যেন আটকে রেখেছে দরজার পাশে। একটুও নড়তে পারছি না। কতকাল, আর কতকাল এভাবে এখানে থাকতে হবে—তবে কি আমিও বন্দী হয়ে রইলাম রায়-ভিলার আশ্চর্য অতীতের এক ক্ষুধিত অধ্যায়ের মধ্যে!

—অর্ণব…অর্ণব…অর্ণব…!

একটা ডাক শুনতে পাচ্ছি যেন বহুদূর থেকে।

কে ডাকছে আমায়?

কণ্ঠস্বরটা যেন চেনা চেনা।

—অর্ণব—।

ডাকটা এবার অনেক কাছে এগিয়ে এসেছে। যেন কানের কাছেই ডাকছে ফিস ফিস করে।

—অর্ণব, অর্ণব ওঠ।

এবার ধড়মড় করে উঠে বসলাম।

একটা টর্চ মুখের কাছাকাছি জ্বলে রয়েছে। মেঘনাদ হুমড়ি খেয়ে রয়েছে আমার দিকে। আমায় চোখ মেলতে দেখে চাপা গলায় বললো—চটপট উঠে পড়। সময় হয়েছে।

ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে রইলাম। এখনও সারা শরীরের ভেতরটা কাঁপুনী অনুভব করছি। শরীরটা ভিজে গেছে ভয়ের ঘামে।

আমি কোথায়?

এবার ধীরে ধীরে নিজেকে ফিরে পাচ্ছি। মনে পড়ছে সব কিছু। আমরা আছি পোড়ো রায়-ভিলার একতলার একটা ঘরে। এক সেকেলে বিশাল পালঙ্কের ওপর।

রাত এখন গভীর। কালো বাদুড়ের মতো নিশুতি রাত পাখা মেলে আছে। ঘরের মোমবাতিটা পুড়ে পুড়ে শেষ হয়ে এসেছে। ঘর আর বাইরের অন্ধকারের সীমারেখা আসছে মুছে।

মাথাটা এখনও ধরে রয়েছে।

একটু আগে যা দেখেছি—তা সবই কি স্বপ্ন ?

কিন্তু রায়-ভিলার নাচঘরে নরেন্দ্রনারায়ণ রায়ের নর্তকী রুক্মিনী বাঈকে শরবতে বিষ মিশিয়ে হত্যা করার সেই দৃশ্যটা—এমন একটা ইতিহাসই না প্রথমদিন বারিনবাবুর মুখে শুনেছিলাম।

এ কি সত্যিই স্বপ্ন না কোন আশ্চর্য মায়াজালে সত্যি সত্যি হাজির হয়েছিলাম রায়-ভিলার শতাব্দী পূর্ব ইতিহাসের পাতায়।

ফস্ করে দেশলাই জ্বাললো মেঘনাদ। তারপর একটা নতুন মোমবাতি জ্বালিয়ে রাখলো কুলুঙ্গির ওপর।

অল্প আলোয় দেখলাম বারিনবাবুও ইতিমধ্যে ঘুম ভেঙে বিছানার ওপর উঠে বসেছেন।

মেঘনাদকে ঘুম ভাঙানোর কারণটা জিজ্ঞেস করতে যাচ্ছি—ঠিক সেই মুহূর্তে রাতের অন্ধকার বিদীর্ণ করে ভেসে এল নারীকণ্ঠের এক যন্ত্রণাকাতর গোঙানী।

আমি উৎকর্ণ হয়ে বসে রইলাম পালঙ্কের ওপর। এই কণ্ঠ কি কোথাও শুনেছি ? এই মৃত্যুকাতর স্বর ?

—রায়-ভিলার অতৃপ্ত বিদেহী আত্মা রুক্মিনী বাঈ। ফিস ফিস করে বললেন বারিনবাবু।

কয়েক সেকেণ্ড বিরতি। তার পর শুরু হল কান্না। হৃদয় নিঙড়ানো সে কী করুণ বিলাপ !

কান্নাটা ভেসে আসছে এই ঘরের ঠিক বাইরের বারান্দাটা থেকে।

কুইক ! চাপা কণ্ঠে হিস্ হিস্ করে উঠল মেঘনাদ ঃ ভূতের সঙ্গে পরিচয়ের এমন সুযোগ আর মিলবে না বারিনবাবু। চলুন এখুনি।

বালিশের তলা থেকে রিভলভারটা পকেটে ভরে এক হাতে টর্চ

অন্য হাতে বারিনবাবুকে হেঁচকা টেনে ঘর থেকে বাইরে বেরিয়ে গেল মেঘনাদ। অগত্যা সব আবেশ ঝেড়ে ফেলে ধারাল কুক্‌রিটা হাতে নিয়ে আমিও মেঘনাদকে অনুসরণ করলাম।



ঘরের বাইরে আবার সেই নিঃশব্দ অন্ধকার। একটু আগের সেই নারীকণ্ঠের গোঙানী কিংবা কান্না থেমে গেছে। মেঘনাদ টর্চ জ্বাললো। একটা মাকড়সা সরসর করে গিয়ে লুকিয়ে পড়লো দেয়ালের এক ফাটলের মধ্যে। কোথায় একটা রাত জাগা পাখি ডেকে উঠল বিশ্রী ভাবে। বুকের ভেতরটা ধ্বক্ করে উঠল। কিন্তু কই, কোথাও কোন

অস্বাভাবিক ব্যাপার তো নেই। একটু আগে দেখা স্বপ্নটা মাথার মধ্যে এখনও যেন ঝিম মেরে রয়েছে।

কিন্তু বেশিক্ষণ এমন ভাবে কাটলো না।

হঠাৎ পাশের দরজা ভেজান ঘরটার ভেতর থেকে ভেসে এল নূপুরের নিক্কণ, সেই সঙ্গে তবলা আর সারেঙ্গির আওয়াজ।

এ আওয়াজ আমার পরিচিত। একটু আগে এমনই এক অধ্যায় ঘটে গেছে আমার সামনে।

আমরা দ্রুত গিয়ে ঢুকে পড়লাম ঘরের ভেতর। টর্চ জ্বাললাম। কই, কেউ কোথাও তো নেই।

কিন্তু চুপ-চাপ বেশিক্ষণ থাকল না। নাচ গান, মাইফেলের ধ্বনি আবার ভেসে এল। এবার অন্য ঘর থেকে।

বিজন গভীর রাতে আমরা ছোটাছুটি করতে লাগলাম একটার পর একটা ঘরে, এই মুহূর্তে আমরা সবাই কেমন সম্মোহিত।

একেই কি বলে ভূতাবেশ?

ইতিমধ্যে সেই নিশির ডাক আমাদের টেনে নিয়ে চলেছে দোতলায়।

দোতলায় উঠে দাঁড়াতেই একটা ডানা ঝটপটানির শব্দে সম্বিত ফিরল। একটা বাদুড় কোথা থেকে এসে কাঁধের ওপর ডানার আঘাত করে আবার ঢুকে গেল অন্ধকার কোণে।

আর তখনই খেয়াল হল মেঘনাদ আমাদের সঙ্গে নেই।

এ সময় কোথায় গেল মেঘনাদ।

এগারো

[চরম সেই মুহূর্ত]

দোতলায় শেষ প্রান্তের ঘরটার ভেতর থেকে এই মুহূর্তে ভেসে আসছে মাইফেলের ধ্বনি। নাচ-গান-বাজনার জমজমাট কলরব। যেন কোন দ্বিতীয় পৃথিবীর দ্বার খুলে গেছে ওখানে।

বারিনবাবু সম্মোহিতের মত টলতে টলতে এগিয়ে চলেছেন। বোধ হয় মেঘনাদের অন্তর্ধানের কথাটা টের পাননি।

আমি এখন কি করবো? আমার এখন কি করা উচিত?

আমার এই মুহূর্তে যে মানসিক অবস্থা নিজেকেও ঠিক সুস্থ বলে ভাবতে পারছি না। আবার নতুন করে স্বপ্ন দেখতে শুরু করলাম না তো?

কিন্তু না, এবার আর স্বপ্ন নয়।

তবে এই ভূতুড়ে মাইফেল কি ভাবে শুনতে পাচ্ছি?

মেঘনাদই বা হঠাৎ উবে গেল কি করে।

বরং সর্বপ্রথম বারিনবাবুকে ফেরাবার চেষ্টা করি। তারপর না হয় দুজনে মিলে খুঁজতে শুরু করবো মেঘনাদকে।

কারণ ভূত না হয়ে ব্যাপারটার মধ্যে যদি কোন কিম্ভূতের কারসাজি থাকে মেঘনাদের কোন একটা দুর্ঘটনা ঘটে যাওয়া আশ্চর্য নয়।

বারিনবাবু ততক্ষণে সামনের ঘরটার মধ্যে ঢুকে পড়েছেন।

সকালে শুনেছিলাম ওইটাই নাকি ছিল এককালে রায়-ভিলার নাচঘর।

কিন্তু এবারও বারিনবাবু ঘরে প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গে বন্ধ হয়ে গেছে বিদেহী আত্মাদের সরব উপস্থিতির ধ্বনি। সব চুপচাপ। এ সময় টর্চটাও হাতের কাছে নেই। ওটা ছিল মেঘনাদের কাছে। বারিনবাবুকে দেখতে পাচ্ছি না।

অন্ধকার ঘরের মধ্যে পা দিলাম। কেমন যেন এক মিষ্টি মিষ্টি গন্ধ নাকে এল। মাথাটা ঝিম ঝিম করতে শুরু করেছে। এ গন্ধ আমার পরিচিত···হ্যাঁ, মনে পড়েছে—ক্লোরোফর্ম। পকেট থেকে রুমাল বার করে দ্রুত বেঁধে নিলাম নাকের ওপর।

আর ঠিক সেই মুহূর্তে রায়-ভিলার জংলা বাগানের দিকটা থেকে ভেসে এল মেঘনাদের চিৎকার—অর্ণব, বারিনবাবু, শিগগির আসুন, শিগগির···।

আর কোনদিকে না তাকিয়ে হুদ্দাড় করে ছুটলাম সেদিকে।

বারো

[পুলিশের আবির্ভাব]

পুলিশী জীপটা এসে ব্রেক কষলো রায়-ভিলার সামনেই। জীপের সামনের আসন থেকে লাফিয়ে নেমে এলেন লোকাল থানার অফিসার-ইনচার্জ। পেছনের আসন থেকে নামলো দুই কনষ্টেবল।

আমি আর মেঘনাদ পাঁচিলের গেটটার সামনে দাঁড়িয়েই ওদের অভ্যর্থনা করলাম।

—আপনার কথামতো একেবারে রাইট টাইমেই হাজির হয়ে গেছি মিঃ ভরদ্বাজ।

মেঘনাদ হেসে বললো, আপনার ওপর আমার সে আস্থা ছিল ইনসপেকটর সিং।

এরপর আমরা সবাই মিলে রায়-ভিলার গেট পেরিয়ে ভেতরে পা বাড়ালাম।

এ নাটকের উপসংহারটা ওখানেই টানা হবে।

আমরা হেঁটে চলছিলাম রায়-ভিলার জংলা বাগানের শিশির ভেজা ঘাসে পা ডুবিয়ে। বেশ লাগছিল। প্রকৃতির এ সময়টা যাকে বলে উষালগ্ন। পুব আকাশে সোনালী রঙ ছড়িয়ে সবে মাত্র সূর্যটা উঁকি মারতে শুরু করেছে। অন্ধকারের শেষ পরশটুকুও মুছে যাচ্ছে। বাতাসে কিছুটা ঠাণ্ডার আমেজ থাকলেও কষ্ট হয় না। গাছে গাছে পাখিদের কাকলী।

ভয়-ভীতি-রহস্যের অবগুণ্ঠন মুক্ত রায়-ভিলা দাঁড়িয়ে আছে ভোরের আলোয়।

ইনসপেকটর সিংএর লম্বা চওড়া পুলিশী চেহারা। মেঘনাদ গতকাল বিকেলেই নাকি লোকাল থানায় গিয়ে ওঁর সঙ্গে কথা বার্তা বলে এসেছে। আমাদের কিচ্ছুটা জানায় নি। অবশ্য এজন্যে মনে খেদ রাখি না। মেঘনাদের স্বভাবটাই এরকম—ঠিক সময়ের আগে ওর মনের কথাটা অন্য কেউ টের পায় না।

মেঘনাদ হাঁটতে হাঁটতে ইনসপেকটর সিংকে গত রাতে রায়-ভিলার রহস্য সমাধানের কাহিনীটাই শোনাচ্ছিল।

এমন অদ্ভুত অভিজ্ঞতা এর আগে আমাদের কখনও হয় নি।

ব্যাপারটা শুধু ভৌতিক না বলে জ্যান্ত ভূতের কাণ্ড বলাই ভাল।

গত রাতে আমরা যখন অশরীরী আচ্ছন্নতায় বিদেহী আত্মার কণ্ঠস্বর আর নূপুরের ধ্বনির পেছনে কক্ষ থেকে কক্ষান্তরে ঘুরে বেড়াচ্ছি—মেঘনাদ রায়-ভিলার জংলা বাগানের মধ্যে এক ভগ্ন ঘরে আবিষ্কার করে ফেলেছে ভৌতিক কর্মকাণ্ডের ঘাঁটিটাকে।

সেখান থেকেই টেপ রেকর্ডার মারফৎ অশরীরী কণ্ঠস্বর আর ভৌতিক নাচ গানের মাইফেল অত্যন্ত দক্ষ কৌশলে ছড়িয়ে দেওয়া হত রায়-ভিলার আনাচে কানাচে লুকনো শক্তিশালী লাউড স্পীকার-এর সাহায্যে।

এ বাড়ির রাতের অতিথিদের অজ্ঞান হওয়ার কারণটাও জানা গেল। বিদেহী কণ্ঠস্বরের রেকর্ড চালাবার আগে রায়-ভিলার একটি ঘরে পূর্ব থেকেই ক্লোরোফর্ম স্প্রে করে রাখা হত। তারপর পরিকল্পনা মাফিক ভূত-গ্রস্ত মানুষটিকে তাড়িয়ে সে ঘরে ঢোকানর পর অজ্ঞান করে ফেলতে দেরী হত না। তারপর সেই জ্ঞান হারা মানুষটিকে ফেলে আসা হত রায়-ভিলা থেকে কিছু দূরে কোন আবর্জনা স্তূপ কিংবা গাছের নীচে।

মানুষটির ঘুম ভেঙে মনে হত সবটাই ভৌতিক ক্রিয়াকর্মের ফল।

ইনসপেকটর সিং শুনতে শুনতে চোখ বড় বড় করে বললেন—এ এলাকার একটা বাড়ির মধ্যে এমন সব কাণ্ড ঘটে চলেছে, অথচ

আমরা কোন খবরই পাই নি !

—কেউ কোন রিপোর্ট করে নি ?

ইনসপেকটর সিং আমতা আমতা করে বললেন—রিপোর্ট অবশ্য একটা পাচ্ছিলাম যে বাড়িটা নাকি ভূতুড়ে তাই মালিক বিক্রি করতে চাইলেও খদ্দের জুটছে না। কিন্তু পুলিশের কাজ তো ভূত ধরা নয় মিঃ ভরদ্বাজ। এখন দেখছি এ ভূত রীতিমত রক্ত মাংসের।

মেঘনাদ বললো—রক্ত-মাংসের ভূতেরা সত্যিকারের ভূতের চেয়ে ঢের বেশি ভয়ঙ্কর ইনসপেকটর।

—কিন্তু এসবের উদ্দেশ্যটা কি ? আর কালপ্রিটটা কে তা তো বললেন না।

—ভাববেন না, কালপ্রিটকে আইনের হাতে তুলে দেব বলে রায়-ভিলারই একটা ঘরে গত রাত থেকে আটকে রেখেছি। সে যে ইতিমধ্যে ধোঁয়া হয়ে অদৃশ্য হয়ে যায় নি, তা বাজী রেখে বলতে পারি। বলতে বলতে হেসে উঠলো মেঘনাদ।

মেঘনাদের কথার ধরনে ইনসপেকটর সিংও না হেসে পারলেন না।

আমরা ততক্ষণে রায়-ভিলার ভেতরে ঢুকে পড়েছি।

তেরো

রহস্যের সমাধান]

গত রাতে যে ঘরে আমরা শুয়েছিলাম সেখানেই আমরা সবাই বসে মেঘনাদের কাছে তার ভূত শিকারের গল্প শুনছিলাম।

আমরা যখন ইনসপেকটর সিংকে আনতে গিয়েছিলাম, বারিনবাবু রায়-ভিলার ঘরে জ্যান্ত ভূতটিকে আটকে রেখে ঘরের সামনে পাহারায় ছিলেন। এখন তিনিও আমাদের মধ্যে এসে বসেছেন।

রায়-ভিলার ভূতও আমাদের সামনে হাত পা বাঁধা অবস্থায় বসে।

মেঘনাদ শোনাচ্ছিল :

—বারিনবাবুর মুখে রায়-ভিলার ইতিহাসের সঙ্গে এর ভৌতিক কাণ্ড কারখানার কথা শুনে প্রথম দিনই ব্যাপারটা আমার স্বাভাবিক মনে হয় নি।

—যেহেতু ভূতের অস্তিত্ব আপনি বিশ্বাস করেন না তাই তো? বারিনবাবুর প্রশ্ন।

—না। মেঘনাদ নড়ে চড়ে বসে বলে—এখানে আমার বিশ্বাস-অবিশ্বাসের চেয়েও বড় যুক্তির কথা। ভূত থাকুক বা না থাকুক, একশো বছর পূর্বের রুক্মিনী বাঈএর অতৃপ্ত আত্মা এতকাল বাদে গত দশ বছর আগে বারিনবাবুর বাবা কৃষ্ণধন রায় মারা যাবার পর থেকেই হঠাৎ সক্রিয় হয়ে উঠলো কেন? কারণ, আসলে ঠিক সেই সময় থেকেই বারিনবাবু রায়-ভিলা বিক্রির বাসনা মনে পোষণ করতে শুরু করেন।

—তার মানে মিঃ ভরদ্বাজ, আপনি বলতে চান এত বড় বাড়িটাকে

ভূতুড়ে বদনাম দিয়ে সস্তায় কিনে ফেলাটাই ছিল ভূতের উদ্দেশ্য ?

ইনসপেকটর সিংএর প্রশ্নে মেঘনাদ সামনের চেয়ারে বসা হাত পা বাঁধা মানুষটির দিকে তাকিয়ে বললো—জ্যান্ত ভূতটি তো সামনেই বসে রয়েছে। উত্তরটা সেই দিক না।

উত্তরে সে এমন কটমট দৃষ্টিতে তাকাল যে তাকে ভূতের দৃষ্টি না বলে শয়তানের দৃষ্টি বলাই ভাল।

মেঘনাদ হেসে উঠে বললো—ও না বললেও আমরা বুঝতে পারি সেটাই ছিল উদ্দেশ্য।

আমি বললাম—কিন্তু ভৌতিক কাণ্ডকারখানাটা যে জংলা বাগানের একটা ঘর থেকেই চলেছে, টেপ রেকর্ড মারফৎ অশরীরী আর্তনাদ গানবাজনার শব্দ ইত্যাদি ছড়ান হয় আর নির্দিষ্ট কোন ঘরে আগে থেকেই ক্লোরোফর্ম স্প্রে করে অজ্ঞান করার ব্যবস্থা করা থাকে, এটা তুই জানলি কি করে ?

মেঘনাদ বললো—শিমূলতলায় এসে রায়-ভিলায় পা দেওয়া পর্যন্ত প্রতিটি পদক্ষেপে আমি চোখ আর মনটা খোলা রেখেছি। তাই এখানে ঢোকার পর থেকেই একটার পর একটা অসংগতি আমার চোখে পড়েছে।

—কি রকম ?

—বারিনবাবু বলেছিলেন রায়-ভিলাতে নাকি গত পাঁচ বছরে কেউ প্রবেশ করে নি। কিন্তু ঢোকার মুখে প্রধান দরজার তালাতে হাত দিয়েই বুঝেছিলাম এ তালা তার পরও খোলা হয়েছে। কারণ তা না হলে এই পাঁচ বছরে এক নাগাড়ে ঢাকা থাকার ফলে তালার ঠিক ফুটো অংশটার সঙ্গে তালার অন্য অংশের ধুলো স্তরের পার্থক্য চোখে পড়ত। বুঝলেন ব্যাপারটা ?

—তা আর বুঝলাম না···

মেঘনাদ বারিনবাবুকে কথা শেষ করতে না দিয়ে বলে চললো : রায়-ভিলার ঘরে বিড়ির টুকরো আমায় আরও সন্দিহান করেছে।

তারপর মোক্ষম প্রমাণ পেলাম পরদিন সকালে রায়-ভিলার অন্য একটা ঘরে যখন মেয়েদের চুল বাঁধার 'হেয়ার ক্লিপ' আর জংলা বাগানের একটা ভাঙা ঘরের মধ্যে ক্লোরোফর্মের শিশির লেবেল ও মোমবাতির জ্বলে যাওয়া অবশেষ দেখতে পেলাম। বাকিটা খুঁজে পেতে আর বেশি দেরী হয় নি। শুধু তাক করে ছিলাম চরম মুহূর্তে হাতে নাতে পাকড়াও করবো বলে।

—কী গভীর চক্রান্ত ভাবুন মশাই, বারিনবাবু বললেন, কিন্তু ওই হেয়ার ক্লিপটা, ওটা তো জ্যান্ত ভূতের মাথায় থাকতে পারে না।

মেঘনাদ এক পলক সামনে বন্দী ভূত মহাশয়ের দিকে তাকিয়ে বললো—জ্যান্ত ভূতের সঙ্গে যে কোন জ্যান্ত পেত্নীরও রাতের অন্ধকারে এই রায়-ভিলায় আনাগোনা ছিল এ তারই প্রমাণ।

—সে জ্যান্ত পেত্নী যে কে তা আশা করি আমি শিগগির আসামী শিউচরণ শর্মার কাছ থেকে বের করে নিতে পারবো মিঃ ভরদ্বাজ।—পুলিশ ইনসপেকটর সিং এবার পাকানো গোঁফে তা দিয়ে উঠে দাঁড়ালেন।

শিউচরণ শর্মা! হ্যাঁ, রায়-ভিলার জ্যান্ত ভূত সেই!

চৌদ্দ

[রহস্য অন্তহীন]

ফেরার পথে চলন্ত ট্রেনের কামরায় বসে বারিনবাবু বলছিলেন, শিউচরণ শর্মা লোকটা ভাল মানুষের মুখোস পরা আসলে এক আস্ত শয়তান তা কি আগে ঘুণাক্ষরে টের পেয়েছিলাম মেঘনাদ বাবু? গত কয়েক বছর যাবৎ আমার সঙ্গে কেমন অন্তরঙ্গতার অভিনয় না করলো।

—একটাই উদ্দেশ্য। বাড়িটার ভূতুড়ে বদনামে হতাশ হয়ে যাতে ওটা ওকেই বিক্রি করেন। মেঘনাদ বললো।

—বলতে গেলে সে কাজ তো প্রায় হাসিল করেই ফেলেছিল। এবারই তো ঠিক করে এসেছিলাম, এবার ওই অপয়া বাড়িটা স্থানীয় প্রতিপত্তিশালী লোক হিসেবে শিউচরণ শর্মাকেই যে কোন দামে হোক, বিক্রি করে যাব। নেহাত আপনারই আগ্রহে···

আমি ওদের কথার মাঝে বললাম, ভূতুড়ে রায়-ভিলায় হেয়ার ক্লিপের রহস্যটা কিন্তু শেষ পর্যন্ত পরিষ্কার হল না মেঘনাদ।

মেঘনাদ বললো—আরে, এ নিয়ে নতুন করে আর ভাবনার কি আছে। শিউচরণ শর্মা লোকটা যে কী পরিমাণ পাজী তা গত কয়েক দিন নানা সূত্রে খবরাখবর যোগাড় করেছি। রাতের অন্ধকারে রায়-ভিলার মধ্যে ও এক বদমায়েসীর আখড়া গড়ে তুলেছিল। সুতরাং চুলের কাঁটা বা বিড়ি পড়ে থাকা মোটেই আর আশ্চর্য কিছু নয়।

বারিনবাবু বললেন—তাছাড়া আসল রহস্য যখন উদ্ধার হয়েছে বাকিটুকুও শিগগির জেনে ফেলবে পুলিশ।

কিন্তু সত্যিই কি তাই ? রাতের রায়-ভিলার সব রহস্যই উদ্ধার হয়েছে ?

তাহলে সেদিনের সেই অদ্ভুত স্বপ্নটার কথা ভুলতে পারছি না কেন ?

ফিরে আসার দিন সকালে বারিনবাবু যখন রায়-ভিলার এক গুদাম ঘরের মধ্যে থেকে তাঁর পূর্বপুরুষ নরেন্দ্রনারায়ণ রায়ের ছবিটা বার করে দেখিয়েছিলেন, আমি চমকে উঠেছিলাম—কী আশ্চর্য মিল এই ছবিটার সঙ্গে আমার স্বপ্নে দেখা বিপুলদেহী অভিজাত পুরুষটির, যে শরবতের সঙ্গে বিষ মিশিয়ে হত্যা করলো তার নর্তকী রুক্মিনী বাঈকে।

এমনটি কি করে হল—নরেন্দ্রনারায়ণের কোন ছবি তো ইতিপূর্বে দেখি নি আমি।

রুক্মিনী বাঈয়ের মুখটাও হুবহু লছমীর মতো কেন ? পরনে তার সেকেলে নর্তকীর পোশাক আর চুলে রায়-ভিলার পোড়ো ঘরে খুঁজে পাওয়া সেই অদ্ভুত লাল রঙের হেয়ার-ক্লিপটা !

স্বপ্ন অবচেতন চিন্তার প্রকাশ—কিন্তু এ স্বপ্নের কি আলাদা কোন অর্থ আছে ?

জানি, এ ভাবনার উত্তর আমি কোনদিনই খুঁজে পাব না।

একটা ছোট্ট নিশ্বাস ফেলে এবার চোখ ফেরালাম জানলার বাইরে।

আলোকিত প্রকৃতির রূপ কী সুন্দর !

—শেষ—

শ্রীশ্রীবোলতা বাবা


শ্রীশ্রী বোলতা বাবা

॥ এক ॥

(মেঘনাদের তাজা খবর)

ধর্মতলা স্ট্রীটের পাক্ষিক 'তাজা খবর' পত্রিকা আপিসের দোতলার কোণের ঘরটায় মেঘনাদ বসে।

সেদিন ঘরে ঢুকেই বুঝলাম ও দারুণ ব্যস্ত।

সামনে অগোছাল টেবিলে স্তূপাকার কাগজপত্তর, প্রেসের প্রুফ, পেন ইত্যাদি। আর মেঘনাদ রীতিমত হুমড়ি খেয়ে ফোনের রিসিভার কানে লাগিয়ে কার সঙ্গে ফোনে কথা বলে চলেছে।

আমায় দেখে শুধু একবার চোখ নাচিয়ে বসতে বললো।

আমি ওর টেবিলের সামনের চেয়ারটায় বসে ওর ফোনের সংলাপে কান পাতলাম।

মেঘনাদের তরফের কথাগুলোই কেবলমাত্র শুনতে পাচ্ছিলাম। মেঘনাদ মাখনের মত মোলায়েম কণ্ঠে বলছে ঃ

"...এ সম্পর্কে আমি আপনার সঙ্গে একটু ব্যক্তিগতভাবে আলাপ করতে চাই মিঃ চাকলাদার—না, না, আমিই যাব আপনার কাছে—বেশ তো, ঘণ্টা খানেকের মধ্যেই পৌঁছে যাব—একটু ধরুন, আপনার ঠিকানাটা নোট করে নিই—(সামনের প্যাডে খস্ খস্ করে ঠিকানা লিখে) ধন্যবাদ—হ্যাঁ, ঠিক আছে—"

এরপর রিসিভারটা দুম্ করে নামিয়ে রেখে মেঘনাদ আমার দিকে তাকিয়ে বললো—এতক্ষণ কথাগুলো তো গিলছিলে, কিন্তু কিছু বুঝলে কি?

—কিস্যু না। আমি মাথা নাড়লাম।

—সে আমি জানি। বলতে বলতে মেঘনাদ সামনের খবরের কাগজটার ভেতরের পৃষ্ঠার একটা অংশ আমার দিকে এগিয়ে দিয়ে

বললো, এই জায়গাটা পড়ে দেখ। ততক্ষণে আমি হাতটা একটু গুছিয়ে নিই।

পড়লাম। ষ্টাফ রিপোর্টারের দেখা একটা আশ্চর্য খবর ঃ

"দিন কয়েক যাবৎ এই কলকাতা শহরে এক নতুন মহাপুরুষের আবির্ভাব ঘটেছে। ভক্তরা তাঁর নাম দিয়েছে 'শ্রীশ্রীবোলতাবাবা'। বাবা নাকি সরাসরি হিমালয় থেকে নেমে এসে উঠেছেন খিদিরপুরে শ্রীমতী অনুসূয়া হাজরার বাড়িতে। বাবা অসীম ক্ষমতাসম্পন্ন এবং বোলতেশ্বরী দেবীর উপাসক। অবিশ্বাসী ভক্তদের পেছনে বোলতার ঝাঁক পর্যন্ত লেলিয়ে দেবার ক্ষমতা রাখেন। এই অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী মানুষটির আশ্রমে ভক্ত সমাগম দিনে দিনে বেড়েই চলেছে।"

খবরটা পড়তে পড়তে আর ধৈর্য রাখতে পারি না। মেঘনাদের দিকে তাকিয়ে বলি—কিন্তু তোর এই বাবা ঘটিত ব্যাপারে থাবা বসাতে যাবার কারণটা কি তা তো বুঝলাম না।

মেঘনাদ কিন্তু আমার কথার জবাবটা হেঁয়ালি করেই দিল—উত্তর পেতে হলে আজই এক্ষুণি তোকে আমার সঙ্গে যেতে হবে।

—কোথায়?

—একটু আগে যাকে ফোন করলাম, সেই চক্রবেড়িয়া রোডের নিতাই চাকলাদারের ফ্ল্যাটে।

—কে তিনি?

—আপাততঃ তাঁর সবচেয়ে বড় পরিচয় তিনি একজন 'বোলতা-আক্রান্ত' ব্যক্তি।

এবার আমার ধৈর্যচ্যুতি ঘটে, আজকালকার কাগজওয়ালাদের কি তিলকে তাল করাটা অভ্যেসে দাঁড়িয়েছে? কেউ যত বড় ক্ষমতা-সম্পন্নই হোন, তাঁর পক্ষে কি কারুর পেছনে বোলতার ঝাঁক লেলিয়ে দেয়াটা সহজ? বোলতা কি কুকুর নাকি?

মেঘনাদ আমার মানসিক অবস্থা অনুমান করেই বললো, এত জল্পনা-কল্পনার দরকার কি, একটু কষ্ট করে গেলেই তো চক্ষু কর্ণের

বিবাদটা মিটে যায়। বলতে বলতে বললো, সত্যি বলতে কি তোর মত আমারও ব্যাপারটা বিশ্বাস করতে মন চাইছে না, কিন্তু তাজা খবরের মালিক হরিসাধনবাবু নিজে বিষয়টিতে ইণ্টারেস্টেড। অতএব,

অতএব আর না বোঝার কিছু নেই।

হরিসাধনবাবু সত্যিকারের একজন ছুঁদে মালিক। উনি বিষয়টিতে ইণ্টারেস্টেড মানেই ওঁর আসল মতলব এই বোলতাবাবার চমকপ্রদ কিছু কর্মকাণ্ড নিয়ে তাজা খবর-এর আগামী সংখ্যায় বেশ একটা চটকদার আর্টিকেল বার করে বিক্রির পরিমাণটা ফাঁকতালে বাড়িয়ে নেয়া। পাঠকের মনের মত রসদ জুগিয়ে কাগজ কি করে চালাতে হয় হরিসাধনবাবু তা বেশ ভাল মতোই বোঝেন।

মুখে বললাম—তবে আর কি, এবার রহস্য সন্ধানে লেগে পড়। পরের কাজে কাঠি দিতে তো মেঘনাদ ভরদ্বাজের জুড়ি নেই।

ইতিমধ্যে দীননাথ দু কাপ চা এনে হাজির করেছে।

মেঘনাদ আমার দিকে চায়ের কাপটা এগিয়ে দিতে দিতে বললো, বন্ধু, যদি রাজি থাক, তবে এ রহস্য সন্ধানে তুমিই আমার যোগ্য সহকারীর ভূমিকা নিতে পার। আরে বাবা এ্যাসিস্টেণ্ট না থাকলে কি আর গোয়েন্দার ইজ্জত থাকে।

চায়ে একটা ছোট্ট চুমুক দিয়ে আমি পরিতৃপ্ত কণ্ঠে বললাম—সে না হয় আমি রাজি হলাম, কিন্তু ব্যাপারটা শেষ পর্যন্ত "অশ্বডিম্ব" না হলে বাঁচি।

—সাপের হাঁচি বেদে চেনে। বলেই কাপের চা-টা এক চুমুকে শেষ করে মেঘনাদ উঠে দাঁড়িয়ে বললো, কিন্তু আমাদের আর দেরী করা চলবে না অর্ণব। আমাদের রহস্যভেদ পর্ব শুরু হল। সর্বপ্রথম যাওয়া যাক ভবানীপুরে চক্রবেড়িয়া রোডে নিতাই চাকলাদারের ফ্ল্যাটে।

অগত্যা আমাকেও উঠে দাঁড়াতে হল।

॥ দুই ॥

(বোলতা-আক্রান্ত নিতাই চাকলাদার)

দরজার ওপর নেমপ্লেটে নামটা দেখে নিয়ে আমরা কলিং বেল টিপলাম।

চাকর এসে দরজা খুলে দিল। মেঘনাদ নিজের নাম বলতেই সে বললো, হ্যাঁ ভেতরে আসুন। বাবু বলেছেন আপনি আসবেন।

তার পিছু পিছু ভেতরে ঢুকলাম। তারপর ডানদিক ঘুরে একটা বন্ধ দরজার সামনে দাঁড়িয়ে সে দরজায় আস্তে আস্তে টোকা মেরে বলতে লাগলো, বাবু, তেনারা এয়েচেন।

আমার কেমন অদ্ভুত মনে হচ্ছিল। এই গরমকালে ভর সন্ধ্যেবেলা বদ্ধ ফ্ল্যাটের মধ্যে দরজা বন্ধ করে ভদ্রলোক করছেনটা কি। অবশ্য তখনও জানতাম না, অদ্ভুত কাণ্ড কারখানার এই সবে শুরু।

ছম্ করে ঘরের দরজা খুলে গেল। একটা ফ্যাসফ্যাসে কণ্ঠস্বর শুনলাম—চটপট ঘরে ঢুকে পড়ুন মশাই। দেরী করবেন না।

চোখে কানে কিছু দেখা শোনার আগেই দুটো হাত ভেতর থেকে বেরিয়ে এসে আমায় আর মেঘনাদকে হিঁচড়ে ভেতরে টেনে নিয়ে গিয়ে সপাটে ঘরের দরজাটা বন্ধ করে দিল।

এ কি কাণ্ড। এমন অভিজ্ঞতা জীবনে কোনদিন হয়নি।

একটু ধাতস্থ হয়ে সামনে তাকিয়ে দেখলাম।

প্রথমে একটা লোমশ গরিলা বলেই মনে হয়েছিল। তারপর বুঝলাম আসলে একজন স্থূলকায় মধ্যবয়সী পুরুষ আমাদের সামনে দাঁড়িয়ে। কিন্তু যেটা সব থেকে অদ্ভুত, তা হল, এই প্রচণ্ড গরমে ঘরের সমস্ত দরজা জানলা বন্ধ করে, আলো, পাখা চালিয়ে ভদ্রলোক ওভার-কোট, ফুলপ্যাণ্ট, মাথায় হনুমান টুপি আর দস্তানা পরে যেন বস্তাবন্দী

হয়ে রয়েছেন। আর তার প্রতিটির রঙই কালো। সে কারণেই প্রথম দর্শনে কালো গরিলা ভেবে চমকে উঠেছিলাম। এই জবরজং মানুষটার সামনে আমার নিজেরই কেমন হাঁফ ধরতে লাগলো।

মেঘনাদ কিন্তু বিন্দুমাত্র বিচলিত হয়েছে মনে হল না, বেশ স্বাভাবিক কণ্ঠেই বললো—আপনিই মিঃ নিতাই চাকলাদার? আমি আপনাকে ফোন করেছিলাম।

—সে তো বুঝতেই পারছি। আপনি নিয়ে আজ হলেন গিয়ে একুশজন দর্শনপ্রার্থী। কিন্তু ইনি কে?

মেঘনাদ আমার সঙ্গে মিঃ চাকলাদারের পরিচয় পর্বটা সমাধা করলো, আমরা পরস্পর নমস্কারের পালা শেষ করলাম।

মেঘনাদ প্রথমেই সরাসরি মূল প্রশ্নে চলে গেল—আপনার এত সাবধানতা বোধ হয় বোলতার ভয়ে?

এতক্ষণে আমারও খেয়াল হয়। ফ্ল্যাটে ঢোকা পর্যন্ত চারদিকে বোলতা উড়তে দেখছি। এত বোলতা একসঙ্গে আজকাল কলকাতা শহরে বিশেষ চোখে পড়ে না।

নিতাই চাকলাদার মেঘনাদের কথার উত্তরে বললেন—শুধু ভয় নয় মশাই, আতঙ্কে। সবই আমার কপাল, নইলে এমন বিপাকে কেউ পড়েছে কখনও?

—একটু গোড়া থেকে ব্যাপারটা বলবেন?

—এর গোড়া কিংবা আগা সবটাই আমার বোঝার বাইরে। সর্টকাটে বলতে পারি, আমি শ্রীশ্রীবোলতাবাবার কোপে পড়েছি।

—আর একটু পরিষ্কার করে যদি বলেন? আমার প্রশ্নটাই যেন মেঘনাদের কণ্ঠে শুনতে পেলাম।

এর উত্তরে নিতাই চাকলাদার যা শোনালেন তা যেমন অদ্ভুত, তেমনি অবিশ্বাস্য। এর কিছুটা অবশ্য আজকের সংবাদপত্রের পৃষ্ঠাতেই দেখেছি। অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন এই বোলতাবাবা দিন পনের

আগে খিদিরপুর অঞ্চলে এসে উঠেছেন অনুসূয়া দেবী নামে জনৈকা ভক্তের গৃহে। বাবা বোলতা বাহিনী। বোলতেশ্বরী দেবীর উপাসক।

—বোলতেশ্বরী। এবার আর না বলে পারি না। হিন্দুর তেত্রিশ কোটি দেব দেবীর মধ্যে এমন নামে কোন দেবী আছেন নাকি? তার আবার বোলতা বাহিনী। দেব দেবীর বাহন হিসেবে বোলতার উল্লেখ কোন হিন্দু পুরাণে আছে কিনা তা আমার জানা নেই।

—আরে অর্ণববাবু, আমি অত শাস্ত্র-টাস্ত্রের ধার না ধারলেও বাড়ির বৃদ্ধ পুরুতমশাইকে জিজ্ঞেস করেছিলাম। তিনি তো স্পেশাল দক্ষিণায় তিন দিন তিন রাত শাস্ত্র ঘেঁটেও বোলতা বাহন খুঁজে পান নি। কিন্তু তবু তো শ্রীশ্রীবোলতাবাবার আশ্রম থেকে চিঠিটা এল।

—চিঠি!

—হ্যাঁ মশাই, দস্তুর মত রেজেস্ট্রি চিঠি, উইথ এ্যাক্‌নলেজমেণ্ট ডিউ।

—কিন্তু কেন?

—সেটাই তো বলতে চাইছি মশাই। নিতাই চাকলাদার তার কথার মাঝে বার বার বাধা পড়তে এবার কিছুটা বিরক্ত হয়েই বলেন—গত হপ্তায় সন্ধ্যেবেলা, সেদিন দোকানে হাফ ডে ছিল, দোকান থেকে ফিরে গা ধুয়ে, ঘাড়ে গলায় পাউডার দিয়ে লুঙ্গি পরে বসেছি, একটা রেজেস্ট্রি চিঠি পেলাম। খুলে দেখি প্রেরক—কলিকালে বোলতেশ্বরী দেবীর সেবক শ্রীশ্রীবোলতাবাবা। বাবা নাকি আদেশ পেয়েছেন পুণ্য বারাণসী ধামে বোলতেশ্বরী দেবীর এক মন্দির প্রতিষ্ঠা করতে হবে। এজন্য তিন লক্ষ মুদ্রার প্রয়োজন। আর সে অর্থ ভক্তরাই দেবে বাবাকে। আমার প্রতি বাবার আদেশ, এক হপ্তার মধ্যে দশ হাজার টাকা প্রণামী আমি যেন বাবার কাছে পৌঁছে দিই।

আমি বললাম—আপনি কি বাবার ভক্ত?

—বাবার কুপুত্তুর। নিতাই চাকলাদার যেন ফুঁসে উঠলেন—

মশাই, ব্যবসা নিয়ে সারাদিন ব্যস্ত থাকি, নিজের বুড়ো বাবার খোঁজ নেবারই সময় পাই না।

—তাহলে আপনি বলতে চান, বোলতাবাবার আশ্রমে গিয়ে আপনার প্রণামীর অর্থ দানের অক্ষমতা জানাবার পরই বাবা আপনার পেছনে বোলতার ঝাঁক লেলিয়ে দিয়েছেন ?

—এক্সজাক্টলি ! নিতাই চাকলাদার মেঘনাদের কথার উত্তরে সঙ্গে সঙ্গে ঘাড় নেড়ে বলেন।

—কিন্তু এ কি করে সম্ভব ? আমি তখনও ব্যাপারটা বিশ্বাস করতে পারি না। কোন মানুষের পেছনে সর্বক্ষণ বোলতার ঝাঁক লেলিয়ে দেয়া কি কোন জাদু মন্ত্রে সম্ভব হতে পারে ?

—সম্ভব যে হয়েছে তা তো আপনারা আমার ফ্ল্যাটে ঢুকেই বুঝতে পারছেন মশাই। গত তিন দিন যাবৎ সবকিছু ছেড়ে এভাবে ঘরে বসে রয়েছি আমি—বলতে বলতেই হঠাৎ ব্যথায় চেঁচিয়ে উঠলেন মিঃ চাকলাদার—উঃ, কামড়েছে। জ্বলে গেল। একটু অন্যমনস্ক হতেই কোত্থেকে এক ব্যাটা এসে নাকের ওপর হুল ফুটিয়ে পালিয়ে গেল—উঃ উঃ—

এরপর কয়েক সেকেণ্ড নীরবতা। মিঃ চাকলাদার হাতের কাছে মজুত করা মলম নাকের ওপর ঘসছেন। মেঘনাদ কেমন অন্যমনস্ক।

নিতাই চাকলাদারই নীরবতা ভেঙে বললেন—মশাই, আমি জানি, সমস্ত ব্যাপারটাই আপনাদের কাছে অবিশ্বাস্য ঠেকছে। আপনাদের আগে যে কজন রিপোর্টার এসেছিলেন, সব শুনে তাদের মধ্যে কেউ অবিশ্বাস করে উড়িয়ে দিয়ে গেছেন, কেউ বা আমার মস্তিষ্কের সুস্থতা সম্পর্কেই সন্দেহ করেছেন—

নিতাই চাকলাদারের কথা শেষ হল না, মেঘনাদ বললো, মিঃ চাকলাদার, আপনি যদি সহযোগিতা করেন, কেসটা নিয়ে আমি একটু এগুতে চাই।

—কি করতে হবে আমায় ?

—আমার অনুরোধ বোলতাবাবাকে প্রণামীর টাকাটা আপাততঃ হুম করে দেবেন না।

—আগামী দশ বছর ধরে ক্রমাগত বোলতার কামড় খেলেও না। আমার মশাই বিশুদ্ধ লোহার টাকা, এত সহজে গলবে না—

বলতে বলতেই আর একবার ককিয়ে ওঠেন নিতাই চাকলাদার। দেবী বোলতেশ্বরীর আর এক সাক্ষাৎ বাহন উড়ে এসে হুল ফুটিয়েছে এবার ওঁর ঠোঁটে।

আমরা ততক্ষণে উঠে দাঁড়িয়েছি, নিতাই চাকলাদারের কাছ থেকে আপাততঃ যা জানার শেষ হয়েছে।

এবার শুরু প্রকৃত রহস্যের সন্ধান।

॥ তিন ॥

(মেঘনাদের চ্যালেঞ্জ)

মেঘনাদ ওর ঘরে অস্থির ভাবে পায়চারী করছিল। আমি সামনের সোফাটাতে চুপচাপ গালে হাত দিয়ে বসে।

একটু আগে লালবাজার থেকে ঘুরে এসেছে মেঘনাদ। ডি. সি. ডি. ডি. মিঃ প্রাণেশ গড়গড়ি মেঘনাদকে ছেলেবেলা থেকে দেখছেন এবং বিশেষ স্নেহ করেন।

মিঃ গড়গড়ির বছর পঞ্চাশ বয়স। শক্ত সমর্থ চেহারা। চেহারায় গাম্ভীর্য থাকলেও ভেতরে যে একটা নরম মন আছে তা কিছুক্ষণ কথা বললেই বোঝা যায়। পদ্মাপারে আদি নিবাস। কিন্তু বহুকাল এখানে থেকেও আদি ভাষাটিকে ছাড়তে পারেন নি। বিশেষ আবেগের মুহূর্তে তা অজস্র ধারায় বেরিয়ে আসে।

মেঘনাদ গিয়েছিল বোলতাবাবার কেসটাতে মিঃ গড়গড়ির পরামর্শ নিতে কিন্তু মিঃ গড়গড়ি নাকি গোড়াগুড়িই ব্যাপারটাকে উড়িয়ে দিয়ে মেঘনাদকে পাল্টা প্রশ্ন করেছেন—শ্রীশ্রীবোলতাবাবাই যে লোকের পেছনে বোলতার ঝাঁক লেলিয়ে দিচ্ছে, তার কি কোন ড্যাফিনিটি প্রমাণ আছে ?

মেঘনাদ বলেছিল, প্রত্যক্ষ প্রমাণ না থাকলেও অনুমানের যথেষ্ট কারণ আছে।

—অনুমান! শুনে হেসেছেন মিঃ গড়গড়ি, তারপর আদি পদ্মাপারের ভাষায় অভিমত ব্যক্ত করেছেন, ছাখ মেঘনাদ, সাফ কথা কই, শুধু অনুমানে কাম কইর‍্যা শ্যাস বয়সে আমি আর হনুমান সাজতে রাজি নই।

মেঘনাদ ক্ষুব্ধ কণ্ঠে বলেছে—তার মানে এ কেস সম্পর্কে কোন দায়িত্বই আপনি নিতে চান না ?

—আহা, মানেডা কি তাই দাঁড়াইল পোলাপান, আমি কই কি, শুধু অভিযোগে কাম হইব না, আমি চাই যারে কয় 'ড্যাফিনিট' প্রুফ !

—বেশ, তাই পাবেন। মেঘনাদ উঠে দাঁড়িয়ে তার চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিয়ে ঘর ছেড়ে আসার সময় বলে এসেছে, আমার কথার সত্যতা আমি প্রমাণ করবোই, তারপর একেবারে চরম মুহূর্তে যখন আপনার প্রয়োজন হবে তখন আমি যা বলবো তাই কিন্তু করতে হবে আপনাকে মিঃ গড়গড়ি।

—ড্যাফিনিটলি ! আফটার হ্যাভিং ড্যাফিনিট প্রুফ ! নিজস্ব উচ্চারণে মিঃ গড়গড়ি মেঘনাদের কথার উত্তর দেন।

ঘরে ফেরার পথে সারাটা পথ নিজের মনে জ্বলতে জ্বলতে ফিরেছে মেঘনাদ। আর তারপর থেকেই অনবরত পায়চারী করে চলেছে।

আমি বাজি রেখে বলতে পারি এটা যদি ও সোজা রাস্তায় হাঁটতো, অন্ততঃ ক্রোশ পাঁচেক পথ পেরিয়ে যেতে পারতো !

হঠাৎ পায়চারী থামিয়ে মেঘনাদ বললো—ওই বক-ধার্মিকের ভণ্ডামীর মুখোসটা খুলে ফেলার একটা পথ আমি পেয়েছি অর্ণব।

আমি বললাম, বোলতাবাবকে না দেখেই তুই বুঝছিস কি করে উনি ভণ্ড বা ভেকধারী ?

—এসব মানুষগুলোকে চিনে ফেলা আজ আর শক্ত ব্যাপার মোটেই নয়। কিছু কিছু ম্যাজিক আর ধূর্ত প্রচারের কায়দায় কিছু সংখ্যক সরল বিশ্বাসী এবং বিশেষ মতলববাজ মানুষকে কাজে লাগিয়ে এরা নিজেদের মহাপুরুষ বানিয়ে নিজেদের ভোগ সুখের ব্যবস্থা কায়েম করা ছাড়া দেশের বা সাধারণ মানুষের কি উপকারটা করছে বলতে পারিস ?

আমি বলতে যাচ্ছিলাম রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ ঋষি অরবিন্দ……

মেঘনাদ আমার কথা শেষ করতে না দিয়েই বললো, —তাঁদের মত মানুষের সঙ্গে আজকের এই মহাপুরুষ বাবাদের তুলনা করে তাঁদের অসম্মান করিসনি অর্ণব। তাঁরা ধর্মকে প্রকৃত অর্থে ব্যাখ্যা করেছেন। তাঁরা জাতির সামনে তুলে ধরেছেন মানবতার আদর্শ। তাঁরা নিজের সর্বস্ব ত্যাগ করে সারা জীবনের সাধনায় দেশের মানুষকে বিবেক আর মুক্তির পথ দেখিয়েছেন—বলতে বলতে ঝলসে ওঠে মেঘনাদ -আর তুই আজকের তথাকথিত 'বাবা'দের জীবনযাপনের দিকে তাকিকে দেখ, ব্যতিক্রম দু' একজন ছাড়া অধিকাংশরই কথায় কাজে কোন মিল নেই। এরা ব্যক্তিগত জীবনে এক একজন ভুঁইয়া বা রাজার জীবনযাপন করে। আর ভক্তরা তাঁদের যেন খাস তালুকের ক্রীতদাস। অথচ আজই সব থেকে বেশি প্রয়োজন মানুষকে যথার্থ মূল্যবোধ আর মানবতার পথ দেখান। এখন আর শুধু বক্তৃতা আর উপদেশে কাজ হবে না—মানুষ চায় দৃষ্টান্ত।

আমি আড়মোড়া ভেঙে বললাম—কিন্তু শ্রীশ্রীবোলতাবাবাও যে আসলে এক ভণ্ড তা ভাবার কোন কারণ পেয়েছিস কি ?

মেঘনাদ বললো—তুই কি মিঃ গড়গড়ির মত 'ড্যাফিনিট' প্রুফ চাইছিস ?

আমি আমতা আমতা করে কিছু বলার আগেই মেঘনাদ এবার বললো, —এ ব্যাপারে প্রাথমিক বিভ্রান্তিটা আশা করি কালই আমরা কাটিয়ে উঠতে পারবো।

—তার মানে ?

—তার মানে আগামীকাল সকালেই আমরা খিদিরপুরে শ্রীশ্রীবোলতাবাবার আশ্রমে ধর্না দিচ্ছি।

—বলিস কি ?

—হ্যাঁ। তার আগে অবশ্য কয়েকটা কাজ সারতে হবে। প্রথমতঃ নিতাইবাবু ছাড়াও কয়েকজন "বোলতাআক্রান্ত" দুর্বিনীত

ভক্তের খোঁজ পেয়েছি, তাদের সঙ্গে আজ রাতের মধ্যেই যোগাযোগ করতে হবে, তারপর নিতাই চাকলাদারকে আমাদের আগামীকালের যাত্রার ব্যাপারটা জানিয়ে ওঁকে আমাদের সঙ্গী হতে অনুরোধ করতে হবে।

—কিন্তু ওঁর ওই হনুমান টুপি, দস্তানা আর ওভারকোট পরা চেহারাটা বাইরের লোকের কাছে খুব দর্শনীয় হবে কি? আমি সন্দেহ প্রকাশ না করে পারি না।

—শ্রীশ্রীবোলতাবাবার আশ্রমে দশ হাজার টাকা দর্শনী এবং বোলতার ঝাঁক থেকে পারমানেন্ট মুক্তি এ দুটি এক সঙ্গে চাইলে এ সহযোগিতাটুকু তাঁকে করতেই হবে।

এরপর আমি আর কোন কথা বলি নি।

॥ চার ॥

(শিম্পাঞ্জীর গায়ে উত্তরীয়)

পরদিন সকালেই আমরা বোলতাবাবার আশ্রমে গিয়ে হাজির হলাম। আমরা বলতে মেঘনাদ, নিতাই চাকলাদার আর আমি।

নিতাইবাবুকে নিয়ে একটা ট্যাক্সি থেকে নামলাম আমরা। জায়গাটা খিদিরপুরে মনসাতলা এলাকায়।

বোলতাবাবার আশ্রমের অভিজ্ঞতাটা বরং প্রবেশ থেকেই শুরু করি।

আমরা আগেই শুনেছি এই বাড়িটা বোলতাবাবার ভক্ত অনুসূয়া দেবী মাস খানেক আগে কিনে নেন বাবার স্বপ্নাদেশ পেয়ে। তখনও তিনি নাকি বাবাকে চোখেই দেখেন নি। তারপর বাবার আবির্ভাব হয় দিন পনের আগে এক পূর্ণিমা রাতে। ওঁকে দেখেই চিনতে পারেন অনুসূয়া দেবী এবং তখন থেকেই তিনি এই আশ্রমে অধিষ্ঠিত।

"শ্রীশ্রীবোলতা আশ্রম" বেশ অনেকটা পরিসর নিয়েই রয়েছে। গেট পার হয়ে ভেতরে ঢুকতেই প্রশস্ত প্রাঙ্গণ। সেখানে নানা জাতের, নানা বয়সের ভক্ত সমাগম চোখে পড়লো। তার মধ্যে নিতাইবাবুর মত "বোলতা আক্রান্ত" কিছু অ-ভক্তও রয়েছে তা তাদের বিচিত্র পোশাক আর মাথার ওপর বোলতার ঝাঁক দেখেই মালুম হয়।

তবে একটা ব্যাপার লক্ষণীয়—খুব গরীব কিংবা হতশ্রী ধরনের কোন মানুষ এখানে নেই। না থাকাটাই স্বাভাবিক। নিতাইবাবুর কাছ থেকে শ্রীশ্রীবোলতাবাবার প্রণামীর বহর যা জেনেছি, এখানে দীন দরিদ্রের মুক্তির পথ নেই।

আশ্রম প্রাঙ্গণে পা দিয়েই ভাগ্যক্রমে প্রধানা সেবিকা অনুসূয়া দেবীর সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়ে গেল। নিতাইবাবুই চিনিয়ে দিলেন। পরনে চওড়া লাল পাড় শাড়ী, আলুলায়িত কেশ, সিঁথিতে সিঁদুর, কপালে এক মস্ত বড় সিঁদুর টিপ। কেমন যেন যোগিনী-যোগিনী ভাব। মেঘনাদকে ওঁর দিকে এগুতে দেখে নিতাইবাবু কানে কানে বলে দিলেন 'বড়মা' বলবেন মশাই। সেদিন দেখে গেছি ওঁর এখানে দারুণ দাপট।

মেঘনাদ গিয়ে ওঁকে প্রণাম করতে উদ্যত হতেই উনি চমকে সরে দাঁড়ালেন, তারপর বিনম্র বিগলিত কণ্ঠে বললেন—এই ছিঃ এ আশ্রমে বাবা ছাড়া আর কারুর প্রণাম নেবার অধিকার নেই।

আমরা চমকিত হলাম। উনি আমাদের দিকে তাকিয়ে মিষ্টি হেসে বললেন—আর্যপুত্রগণের কোথা হতে আগমন হয়েছে? কি কারণ?

নিতাইবাবুর মুখে আগেই শুনে এসেছিলাম, এ আশ্রমে আগন্তুক ভক্তদের বৈদিক "আর্যপুত্র" সম্বোধন করা হয়। নিতাইবাবুর মতে সরলপ্রাণ ভক্তদের চমকে দেবার এ এক কায়দা।

অনুসূয়া দেবীর প্রশ্নের উত্তরে মেঘনাদ আরও বিনম্র বিগলিত কণ্ঠে বললো—এখানে আসার তো একটাই উদ্দেশ্য থাকে বড়মা, বাবার শ্রীপাদপদ্ম দর্শন!

মনে মনে বললাম—বাহবা, মেঘনাদ, তোর কত রূপই দেখবো।

অনুসূয়া দেবী বললেন—আপনাদের পরিচয়?

আমরা কিছু বলার আগেই নিতাই চাকলাদার চিড়-বিড়িয়ে উঠলেন—এরা মস্ত গুণী লোক, নামকরা সাং······

—সাং······সাংহাই······নিতাই চাকলাদারের কথাটা মুখ থেকে প্রায় কেড়ে নিয়েই মেঘনাদ বললো—সাংহাইতে আমাদের দুই ভাইএর মস্ত ব্যবসা আছে। আমি মেঘনাদ আর আমার ভাই অর্ণব। এবার কলকাতা এসে শ্রীশ্রীবোলতাবাবার মাহাত্ম্য শুনে······

—বুঝলাম আর্যপুত্রগণ। বড়মা অনুসূয়া দেবী এতক্ষণে কিছুটা প্রসন্ন হয়েছেন মনে হল, কে জানে তা আমাদের দুই ভাইএর মস্ত ব্যবসার কথা শুনে কিনা, কিন্তু পরক্ষণেই উনি আমাদের হতাশ করতে চেয়ে বললেন—কিন্তু আমি দুঃখিত, দিনে দিনে যে ভাবে ভক্ত সমাগম বেড়ে চলেছে বাবা আর আগে থেকে দিনস্থির না করে ভক্তদের সঙ্গে দেখা করতে পারছেন না।

অর্থাৎ এখানেও এ্যাপয়েন্টমেন্ট-এর প্রয়োজন।

মেঘনাদ কিন্তু বিন্দুমাত্র দমে নি, বরং ওর গদগদ ভক্তি যেন বেড়েই চলেছে, ও তখন বলছে—বড়মা, কথায় বলে ভক্তের ভগবান, আপনি যদি নিজে একটু অনুগ্রহ করে বাবার কাছে বলেন, মানে বহুদূর, সেই সাংহাই থেকে এসেছি মাত্র কয়েকটা দিন ছুটি নিয়ে।

বলতে বলতে আমায় টিপে দেয় মেঘনাদ, আমিও সানাইএর সঙ্গে পোঁ ধরি—হ্যাঁ বড়মা, সাত সমুদ্দুর পেরিয়ে এসেছি শুধু শ্রীশ্রীবাবা আর দেবী বোলতেশ্বরীর মহিমা শুনে!

কে বলে কথায় চিঁড়ে ভেজে না! তোষামোদে ভগবানও জব্দ তো মানুষ কোন ছার। এই সঙ্গে 'সাংহাইএর মস্ত ব্যবসার' টোপ তো মেঘনাদ আগেই দিয়ে রেখেছে। অতএব বড়মা হাঁক ছাড়লেন, —বৎস হাবলাচরণ......!

একটা প্যাংলা চেহারার গেরুয়া পরা তরুণ ভক্ত মাথায় তার ওজনের চেয়েও বেশি ভারী এক রাবড়ির হাঁড়ি নিয়ে যাচ্ছিল, বড়মার ডাকে এগিয়ে এল।

হাবলাচরণ কাছে এলে অনুসূয়া দেবী বললেন, —আমার আদেশ জানিয়ে বিশেষ তালিকায় এঁদের নামগুলো লিখিয়ে নাও, তারপর বাবার ঘরে নিয়ে এস। আমি সেখানেই থাকবো। বাবার যোগ-ভঙ্গের সময় হয়েছে।

বড়মা অনুসূয়া দেবী চলে গেলেন।

—আস্‌সুন আরজপুত্তুররা, ওই স্‌সামনে অফিস, ওখানে আগে স্‌সবার নামটা রেজেস্‌টিরি করিয়ে নিন। হাবলাচরণ তার রাবড়ির



হাঁড়ি আর এক আশ্রম সেবকের মাথায় চালান করে আমাদের প্রতি মনোযোগী হয়েছে।

কিন্তু এ কি ভাষা! হাবলাচরণের কণ্ঠ মহিমায় চমকে না উঠে পারি না। যেমন ওর চেহারার রুক্ষতা, তেমনি ভাষাজ্ঞান আর বাকভঙ্গি—'স' অক্ষরটার তো শ্রাদ্ধ করে ছাড়লো।

মেঘনাদের দিকে তাকালাম, ও খুব আস্তে আমার কানের কাছে মুখ এনে বললো, শিম্পাঞ্জী গায়ে উত্তরীয় জড়ালেই কি সে রাম নাম করতে পারে অর্ণব?

কিন্তু হাবলাচরণের মত আশ্রম সেবক বোলতাবাবার কোন উদ্দেশ্য চরিতার্থ করে?

এর উত্তর পেয়েছিলাম আরও দিন কয়েক বাদে!

॥ পাঁচ ॥

(বাবার যোগভঙ্গ)

নিতাই চাকলাদার বড়মার কাছে মেঘনাদের পরিচয় দিতে গিয়ে আবেগের বশে 'সাংবাদিক' বলতে যাওয়ার পর থেকেই আর উচ্চবাচ্চ করছেন না, সম্ভবতঃ মনে মনে একটু অপরাধী হয়ে রয়েছেন। কারণ এখানে পা দেবার আগে থেকেই আমাদের মধ্যে ঠিক ছিল এখানে মেঘনাদ তার আত্মপরিচয় দেবে না, কারণ একে সাংবাদিক তায় রহস্যভেদী এমন মানুষ এমন জায়গায় নিশ্চয়ই বাঞ্ছিত নয় !

বোলতাবাবার মূল আশ্রম কক্ষের দিকে যতই আমরা এগিয়ে চলেছি—ভিড় আর বোলতা দুই বাড়তে দেখছি।

—এক হপ্তা আগে এসেও এমন হুড়োহুড়ি দেখিনি মশাই, বোলতার ঝাঁক লেলিয়ে বাবা বেশ জমিয়ে নিলেন। এতক্ষণ বাদে নিতাই চাকলাদার আবার মুখ খুললেন।

গম্ভীর শঙ্খধ্বনি ভেসে এল। সম্ভবতঃ বাবার যোগভঙ্গ হয়েছে—এ তারই ঘোষণা !

ইতিমধ্যে আমরা শ্রীশ্রীবোলতাবাবার আশ্রম কক্ষের কাছাকাছি পৌঁছে গেছি।

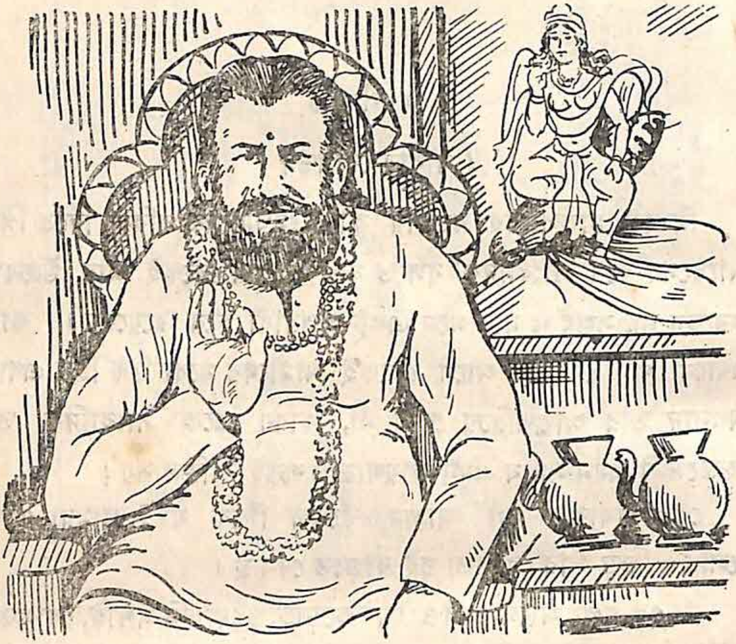
কক্ষ না বলে বরং ওটাকে 'দেওয়ানী আম'ই বলা উচিত—কারণ বাবা এখানেই ভক্তদের সঙ্গে দরবারে বসেন।

আমরা বিরাট ঘরটির ভেতরে ঢুকলাম।

ভেতরে এক অভূতপূর্ব দৃশ্য !

ঘরের একেবারে শেষপ্রান্তে এক মহার্ঘ সিংহাসনে শ্রীশ্রীবোলতাবাবা

রয়েছেন। পরনে গেরুয়া রঙের সিল্কের ঢোলা হাতা পাঞ্জাবী, ধুতি, একমাথা বাবরি চুল, দাড়ি। বাবাকে দূর থেকে এখনও কেমন



ধ্যানস্থ বলেই মনে হচ্ছে। ডান হাতটি বরাভয়ের ভঙ্গিতে উঠে রয়েছে। বাঁ দিকে পাশাপাশি দুটি কমণ্ডলু। একটির রঙ লাল। বাবার চেহারাটি বেশ নাদুস নুদুস। বয়স্ক ভক্তরা যাই বলুন—বছর ৪৫-এর বেশি মনে হয় না।

বাবার পেছনে মা বোলতেশ্বরীর বিরাট একটি পটচিত্র। ছবিতে দেখা যাচ্ছে এক হিংস্র-দর্শন বোলতার পিঠে অধিষ্ঠান করে মা বোলতেশ্বরী যেন উড়ে আসছেন। মা বোলতেশ্বরী চতুর্ভুজা, ভীষণ দর্শনা।

বোলতাবাবার সামনে অসংখ্য ভক্তের সমাগম। গদ গদ চিত্তে ওরা সমস্বরে বোলতাবাবার দয়া প্রার্থনা করে চলেছে। ভক্তদের

কোলাহল আর হাজার হাজার বোলতার ভন্ ভন্—এমন দৃশ্য একত্রে কেউ কখনও দেখেছে কিনা আমার জানা নেই।

ইতিমধ্যে ঘরের অনেকটা ভেতরে আমরা ঢুকে পড়েছি। আমাদের লক্ষ্য বোলতাবাবার একেবারে সামনে ঠাঁই করে নেওয়া।

ইতিমধ্যে কয়েকজন অতি-ভক্ত বোলতাবাবাকে ঘিরে ফেলেছে। তিনজন তরুণী ভক্ত হাত পা টিপতে শুরু করেছে, দুজন মাথা আর একজন ভুঁড়িতে হাত বুলিয়ে দিচ্ছে।

—কি ডেঞ্জারাস কাণ্ড কারখানা দেখুন। এতগুলো মানুষকে এমন অনুগত ভক্ত বানিয়ে রাখলো কি করে বলুন তো?

নিতাই চাকলাদারের কথা শেষ হবার আগেই শুরু হয়ে গেল বোলতাবাবার নাম গান। মূল গায়িকা অবশ্যই বড়মা অনুসূয়া দেবী। অন্যান্য ভক্তরাও কীর্তনের সুরে কণ্ঠ মেলালেন:

"শুন শুন ভক্তজন বিচিত্র কথন
বোলতাবাবার কথা শুন দিয়া মন।
কলিকালের মধ্যযামে বিংশ শতকে
আবির্ভূতা বোলতেশ্বরী এই ধরাত্বকে।
দেবী হলেন অধিষ্ঠিতা বাবার ঘরে
ভীষণ রূপা বাহন ঐ বোলতার উপরে।
বোলতাবাবা কলিকালে তুষ্ট যদি হন—
শত্রু বিনাশ, লক্ষ্মী লাভ, বাঞ্ছা পূরণ॥"

নাম গান চলেছে। মেঘনাদ নিতাই চাকলাদারের কানের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে চুপি চুপি বললো—মিঃ চাকলাদার, আমরা কিন্তু রঙ্গমঞ্চে ঢুকে পড়েছি। এবার থেকে আর ভুল করবেন না।

আমি আর একটু যোগ করে বললাম—অর্থাৎ আপনার 'সাং' সামলাতে 'সাংহাই' যাবার মত নতুন কোন পরিস্থিতিতে যেন পড়তে না হয়।

—ওটুকু মনে রাখলে তো মশাই ডিক্সনারী থেকে 'স্লিপ অফ টাং' কথাটাই তুলে দিতে হয়······

আরও কি বলতে যাচ্ছিলেন নিতাই চাকলাদার তার আগেই একটা হুঙ্কার উঠে দিক বিদিক কাঁপিয়ে দিল।

—জয় শব্দব্রহ্ম !

চমকে তাকিয়ে দেখি বোলতাবাবা সম্পূর্ণ ভাবে দু চোখ খুলে তাকিয়েছেন। চোখ দুটো জ্বলছে ভাঁটার মত।

বাজখাঁই গলায় বোলতাবাবা আবার চেঁচিয়ে উঠলেন—কলিতে জীবের মুক্তি নামে। নাম কর। দেবী বোলতেশ্বরীর নাম। নমঃ বোলতেশ্বরী··· !

নাম গান বন্ধ হয়েছে। বোলতাবাবার কণ্ঠে কণ্ঠ মিলিয়ে ভক্তরা রব তুললো—নমঃ বোলতেশ্বরী।

আর সব কণ্ঠ ছাপিয়ে মেঘনাদের ভক্তি বিহ্বল গদ-গদ কণ্ঠ শোনা গেল—নমঃ নমঃ শ্রীশ্রীবোলতাবাবা !

॥ ছয় ॥

(জয় শব্দব্রহ্ম)

পূর্ব পরিকল্পনা মত নিতাই চাকলাদারই সর্বপ্রথম বোলতাবাবার সামনে গিয়ে হাত জোড় করে হাঁটু গেড়ে বসলেন। ডাইনে বাঁয়ে আমি আর মেঘনাদ।

নিতাই চাকলাদার বোলতাবাবার পদস্পর্শ করতেই বাবা জলদ গম্ভীর স্বরে বললেন—কে, কে তুমি আর্যপুত্র ?

—আজ্ঞে আমি আপনার এক হতভাগ্য বোলতা-আক্রান্ত সেবক বাবা। আমার নাম নিতাই চাকলাদার। মিঃ চাকলাদার এবার আর মেঘনাদের শেখান বুলি ছাড়তে ভুল করলেন না।

বোলতাবাবা ডাকলেন—দেবী অনুসূয়ে ?

অনুসূয়া দেবী ওরফে বড়মা সঙ্গে সঙ্গে সাড়া দিলেন—আদেশ করুন বাবা ?

—বৎস নিতাই কি বোলতেশ্বরী মায়ের ইচ্ছা পূরণ করেছে ?

—না বাবা।

—সেই কথাই নিবেদন করতে এসেছি বাবা। নিতাই চাকলাদার এবার আর অভিনয়ে ভুল করলেন না। বললেন, যদি আর অন্তত দিন সাতেক সময় এই অধম ভক্তকে দেন, মানে কাজ কারবারের অবস্থা বড়ই মন্দা, বাজারে লোহার দর ক্রমেই নামতে শুরু করেছে।

—সে দর আবার উঠবে। বোলতাবাবা বরাভয়ের ভঙ্গিতে বললেন—মা বোলতেশ্বরীর কৃপায় লোহার দর সোনাকে ছাড়িয়ে যেতে পারে।

—কিন্তু বাবা, এখনকার মত কয়েকটা দিন…

—তথাস্তু! বোলতাবাবা হাত তুললেন—কিন্তু মনে রেখো নিতাই, যতদিন না তুমি মায়ের ইচ্ছা পূরণ করবে বোলতেশ্বরী মায়ের বাহনের দলও তোমায় পরিত্যাগ করবে না।

—কিন্তু বাবা, বোলতার কামড়ে আর যে বাঁচি না।

—মূর্খ! অকস্মাৎ হুঙ্কার দিয়ে উঠলেন বোলতাবাবা—ওরা নিছক বোলতা নয়, মা বোলতেশ্বরীর অভিশাপে পতঙ্গ রূপ প্রাপ্ত পাপাত্মারা প্রায়শ্চিত্ত করে চলেছে। কাল ফুরোলেই মায়ের চরণে আশ্রয় পাবে।

বলতে বলতে হঠাৎ থেমে গেলেন বোলতাবাবা, ওঁর দৃষ্টিটা তখন আমার আর মেঘনাদের দিকে। বললেন—নিতাই?

—বাবা?

—সাংহাই-এর এই তুই ব্যবসায়ী যুবক তোমার সঙ্গী হয়ে এসেছে কি অভিপ্রায়ে?

উত্তরটা মেঘনাদই দিল। বিগলিত ভক্তি তুলতুলে কণ্ঠে বললো —আপনার শ্রীপাদপদ্ম দর্শন করবো, এই মাত্র অভিপ্রায়ে বাবা।

—শুভস্তু। আজই মায়ের কাছে তোমাদের সম্পর্কে মায়ের কি অভিপ্রায়, জেনে নেব…জয় শব্দব্রহ্ম!

বলতে বলতে অকস্মাৎ উঠে দাঁড়ালেন বোলতাবাবা, শিবনেত্র হয়ে নিস্পন্দ হয়ে গেলেন। হাত তুটোর ভঙ্গি যেন কথাকলি নাচের মুদ্রার মত। ঠোঁট তুটো কাঁপতে লাগল অনেকটা সিনেমায় দেখা শ্রীরামকৃষ্ণের এক দক্ষ ভূমিকাভিনেতার কায়দায়।

মেঘনাদ ডাকলো—বাবা।

বাবার আর সাড়া নেই। এবার বড়মা অনুসূয়া দেবী এগিয়ে এলেন, চুপি চুপি বললেন—ডাকবেন না। বাবার হঠাৎ ভাব সমাধি হয়েছে। আপনারা ভাগ্যবান! বাবা বোধ হয় সমাধিতে আপনাদের সম্পর্কেই মায়ের সঙ্গে আলোচনা করে নির্দেশ নিচ্ছেন। বাবার সমাধি ভঙ্গ হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করুন আর্যপুত্রগণ।

অগত্যা রামভক্ত হনুমান সেজে সকলের মধ্যে আমরাও বসে রইলাম। অবশ্য ভাব সমাধিতে মা বোলতেশ্বরীর কি আদেশ হবে আমার জানা। আর জানা বলেই মনের মধ্যে ভেসে উঠলো আমার আর মেঘনাদের বিচিত্র রূপ—পরনে ওভারকোট, মাথায় হনুমান টুপি, হাতে দস্তানা আর শরীরের চারপাশে বোলতার ঝাঁক।

ভক্তবৃন্দ গুঞ্জন করে চলেছে।—জয় বোলতাবাবা—জয় মা বোলতেশ্বরী। মেঘনাদও ওদের সঙ্গে সুর মেলাতে ভোলে নি।

আশ্চর্য মানুষ যা হোক।

॥ সাত ॥

(হেঁয়ালির জট)

'বোলতা আশ্রম' থেকে ফেরার পর পুরো চব্বিশ ঘন্টা মেঘনাদের কোন পাত্তা পাই নি। বেশ কয়েকবার ওর বাড়িতে ফোন করেও ফল হয় নি। গেল কোথায় মেঘনাদ ?

গতকাল যা ভেবেছি তাই হয়েছে। যোগভঙ্গের পর শ্রীশ্রী-বোলতাবাবা মা বোলতেশ্বরীর নির্দেশ জারি করেছে আগামী তিন দিনের মধ্যে বিশ হাজার টাকা আশ্রমে দান করতে হবে। কারণ সেই একই—কলির দেবী বোলতেশ্বরীর মন্দির প্রতিষ্ঠা হবে বারাণসীধামে।

ফেরার পথে নিতাই চাকলাদারকে বেশ খুশি খুশি মনে হচ্ছিল। সম্ভবতঃ খুব শিগগির ওঁর দলে আর একজন পড়বে এই আনন্দে। একবার তো বলেই ফেললেন—আপনার আগে থেকেই একটা ওভারকোট আর হনুমান টুপি কিনে রাখা উচিত মেঘনাদবাবু, তাহলে বোলতার ঝাঁকের 'সাডেন এ্যাটাকটা' আপনি সামলে উঠতে পারবেন।

মেঘনাদ তখন এ কথার কোন জবাব দেয় নি, কিন্তু পরদিন সকাল থেকেই ও নিপাত্তা।

শেষ পর্যন্ত পরদিন সন্ধ্যেবেলা ওর টেলিফোন পেলাম। শুধু সংক্ষিপ্ত দুটি কথা—চলে আয়। কথা আছে।

আর দেরী না করে সোজাসুজি গিয়ে হাজির হলাম ওর ঘরে।

দেখলাম মেঘনাদ একটা সোফায় বোলতাবাবার মতই ধ্যানস্থ হয়ে বসে রয়েছে। আমার পায়ের শব্দে চোখ খুললো, তারপর বললো—বোস, শুনলাম তুই বার কয়েক ফোন করেছিলি ?

—কিন্তু তুই বেপাত্তা হয়েছিলি কোথায় ?

—আমি তো বেপাত্তা মাত্র কয়েক ঘণ্টার জন্য। কিন্তু এদিকে আর একজনের সত্যিকারের বেপাত্তা হবার খবর আছে দেখ।

বলতে বলতে গত পরশু তারিখের খবরের কাগজ থেকে একটা কাটিং আমার দিকে এগিয়ে দেয় মেঘনাদ।

খবরটায় চোখ বুলোই। একটা সংক্ষিপ্ত সংবাদ। আমার কাছে তা এমন কিছু গুরুত্বপূর্ণ মনে হল না।

মেঘনাদ আমার দিকে তাকিয়ে বললো—পড়লি ?

হ্যাঁ পড়লাম। প্রখ্যাত ক্রোম্যাটোগ্রাফার ডঃ অলকেশ সেন গত এক সপ্তাহ যাবৎ নিরুদ্দেশ হয়েছেন। এ খবরটার কথাই বলছিস তো ?

—একমাত্র সেটাই তো কাগজের এই কাটিং-এ আছে, অতএব···

—কিন্তু ওই নিরুদ্দেশের সঙ্গে আমাদের বোলতাবাবা কেস-এর সম্পর্ক কি ? আমি বিরক্ত ভাবে বলি—কলকাতা শহরে প্রতি সপ্তাহে বিভিন্ন পেশার ঝুড়ি ঝুড়ি লোক নিরুদ্দেশ যাত্রা করছে···

—তুই একটা আস্ত মাথা মোটা।

—অ্যাঁ! এবার আমি থমকে যাই।

—'ক্রোম্যাটোগ্রাফ' কথাটার অর্থ জানিস ? মেঘনাদ বলে।

—না। অকপটে ঘাড় নাড়ি।

—'ক্রোম্যাটোগ্রাফ' মানে গন্ধ বিজ্ঞান। ডঃ অলকেশ সেন এ দেশের এক নামকরা গন্ধ বিজ্ঞানী।

—গন্ধ বিজ্ঞানী! মেঘনাদের খামোখা এসব প্রসঙ্গের কোন মাথা-মুণ্ডুই বুঝতে পারছি না।

মেঘনাদ আমার মনোভাব বুঝে কথাটা আর একটু ঘুরিয়ে বললো —বিজ্ঞানের এই সাম্প্রতিক শাখাটিতে বর্তমানে সার বিশ্বে নানা পরীক্ষা টরিক্ষা চলছে। কৃত্রিম উপায়ে গন্ধ সৃষ্টির দ্বারা পৃথিবীতে অনেক কিছু সমস্যারই সমাধান করা যেতে পারে।

সমাধান তো দূরের কথা, এসব শুনে সমস্যা আমার বেড়েই গেল। বললাম,—কিন্তু বোলতাবাবার সঙ্গে এর যোগ কোথায়?

—যোগটা যে কি এবং কোথায় সেটাই তো জানতে আজ সকালে গিয়েছিলাম ডঃ অলকেশ সেনের ল্যাবরেটরি এ্যাসিসটেণ্ট চন্দন সোমের সঙ্গে দেখা করতে।

—কিছু লাভ হল?

—লোকসান যে হয়নি আপাততঃ এটুকু বলতে পারি।

মেঘনাদের ক্রমাগত হেঁয়ালি স্বাভাবিক ভাবেই আমার ধৈর্যচ্যুতি ঘটাচ্ছিল। এবার কিছুটা জোরের সঙ্গেই বলি—কিন্তু এদিকে যে তিনদিনের মধ্যে বোলতাবাবার প্রণামীর টাকা না মেটালে নিতাই চাকলাদারের দশা হবে, সে ব্যাপারে কিছু ভেবেছিস?

—না, অতটা গড়াতে দেব না। আশ্চর্য নির্বিকার ভঙ্গিতে মেঘনাদ টেলিফোন ডাইরেকটরির পাতা ওল্টাতে ওল্টাতে প্রসঙ্গ বদলে বললো—বরং আমার চিন্তায় বৃথা মাথা গরম না করে ওই যে লোকটা জানলা দিয়ে দেখা যাচ্ছে বাড়ির সামনে চায়ের দোকানটায় বসে এ বাড়ির দিকে তাকিয়ে আছে ওকে আগে কোথাও দেখেছিস কি না ভাব।

মেঘনাদের এই আচমকা প্রসঙ্গ পরিবর্তনে প্রথমটা থতিয়ে যাই, তারপর বাইরের দিকে তাকিয়ে দেখি মেঘনাদ ঠিকই লক্ষ্য করেছে। একটা ছোকরা—একমুখ দাড়ি, পরনে পায়জামা, হাফসার্ট, খুব সাধারণ চেহারা, হাতে একটা ব্যাগ নিয়ে একটু দূরে একটা চায়ের দোকানের সামনে বসে এদিকে মাঝে মাঝে দৃষ্টি দিচ্ছে আর ফুক ফুক করে বিড়ি টানছে। ওর আচার আচরণ বিলক্ষণ সন্দেহজনক।

মেঘনাদ ফোনের ডায়াল ঘোরাতে ঘোরাতে ধীর কণ্ঠে বললো,—ভেবে দেখ তো, ওকে আগে কোথাও দেখেছিস কি না। যদিও চেহারাটা কিছুটা বদলেছে, তবু ওকে আমরা চিনি। গতকাল থেকেই সর্বক্ষণ ও আমার পেছনে লেগে রয়েছে।

আমি ততক্ষণে দ্রুত চিন্তা করতে শুরু করেছি। ঠিকই বলেছে মেঘনাদ—ওই লোকটাকে আমি চিনি······কোথায় যেন দেখেছি ······ভাবতে ভাবতেই মনে পড়লো······রুক্ষ চোয়াড়ে চেহারা, কপালের ওপর একটা 'আব'—ও হাবলা, বোলতাবাবার আশ্রমের সেই হাবলাচরণ।

কিন্তু মেঘনাদকে সর্বক্ষণ ও অনুসরণ করছে কেন? এখন ওই চায়ের দোকানে বসে কি করছে? ওর হাতের ব্যাগেই বা কি আছে?

মেঘনাদের দিকে তাকালাম। ও তখন ফোনে কার সঙ্গে কথায় ব্যস্ত।

হেঁয়ালির জট আরও পাকিয়ে গেল।

সমাধান তো দূরের কথা, এসব শুনে সমস্যা আমার বেড়েই গেল। বললাম,—কিন্তু বোলতাবাবার সঙ্গে এর যোগ কোথায়?

—যোগটা যে কি এবং কোথায় সেটাই তো জানতে আজ সকালে গিয়েছিলাম ডঃ অলকেশ সেনের ল্যাবরেটরি এ্যাসিসটেণ্ট চন্দন সোমের সঙ্গে দেখা করতে।

—কিছু লাভ হল?

—লোকসান যে হয়নি আপাততঃ এটুকু বলতে পারি।

মেঘনাদের ক্রমাগত হেঁয়ালি স্বাভাবিক ভাবেই আমার ধৈর্যচ্যুতি ঘটাচ্ছিল। এবার কিছুটা জোরের সঙ্গেই বলি—কিন্তু এদিকে যে তিনদিনের মধ্যে বোলতাবাবার প্রণামীর টাকা না মেটালে নিতাই চাকলাদারের দশা হবে, সে ব্যাপারে কিছু ভেবেছিস?

—না, অতটা গড়াতে দেব না। আশ্চর্য নির্বিকার ভঙ্গিতে মেঘনাদ টেলিফোন ডাইরেকটরির পাতা ওল্টাতে ওল্টাতে প্রসঙ্গ বদলে বললো—বরং আমার চিন্তায় বৃথা মাথা গরম না করে ওই যে লোকটা জানলা দিয়ে দেখা যাচ্ছে বাড়ির সামনে চায়ের দোকানটায় বসে এ বাড়ির দিকে তাকিয়ে আছে ওকে আগে কোথাও দেখেছিস কি না ভাব।

মেঘনাদের এই আচমকা প্রসঙ্গ পরিবর্তনে প্রথমটা থতিয়ে যাই, তারপর বাইরের দিকে তাকিয়ে দেখি মেঘনাদ ঠিকই লক্ষ্য করেছে। একটা ছোকরা—একমুখ দাড়ি, পরনে পায়জামা, হাফসার্ট, খুব সাধারণ চেহারা, হাতে একটা ব্যাগ নিয়ে একটু দূরে একটা চায়ের দোকানের সামনে বসে এদিকে মাঝে মাঝে দৃষ্টি দিচ্ছে আর ফুক ফুক করে বিড়ি টানছে। ওর আচার আচরণ বিলক্ষণ সন্দেহজনক।

মেঘনাদ ফোনের ডায়াল ঘোরাতে ঘোরাতে ধীর কণ্ঠে বললো,—ভেবে দেখ তো, ওকে আগে কোথাও দেখেছিস কি না। যদিও চেহারাটা কিছুটা বদলেছে, তবু ওকে আমরা চিনি। গতকাল থেকেই সর্বক্ষণ ও আমার পেছনে লেগে রয়েছে।

আমি ততক্ষণে দ্রুত চিন্তা করতে শুরু করেছি। ঠিকই বলেছে মেঘনাদ—ওই লোকটাকে আমি চিনি······কোথায় যেন দেখেছি ······ভাবতে ভাবতেই মনে পড়লো······রুক্ষ চোয়াড়ে চেহারা, কপালের ওপর একটা 'আব'—ও হাবলা, বোলতাবাবার আশ্রমের সেই হাবলাচরণ।

কিন্তু মেঘনাদকে সর্বক্ষণ ও অনুসরণ করছে কেন? এখন ওই চায়ের দোকানে বসে কি করছে? ওর হাতের ব্যাগেই বা কি আছে?

মেঘনাদের দিকে তাকালাম। ও তখন ফোনে কার সঙ্গে কথায় ব্যস্ত।

হেঁয়ালির জট আরও পাকিয়ে গেল।

॥ আট ॥

(ডি. সি. ডি. ডি-র উদ্যোগ)

লালবাজারে ডি. সি. ডি. ডি. মিঃ প্রাণেশ গড়গড়ির ফোনটা বেজে উঠলো।

রিসিভার তুললেন মিঃ গড়গড়ি।

—হ্যালো……ইয়েস, ডি. সি. ডি. ডি. মিঃ গড়গড়ি কইতাসি …কে, মেঘনাদ, কও…এ্যাঁ…কও কি—একেবারে ড্যাফিনিট প্রুফ পাইছ… ? এ তো মোষ্ট সাসপিসাস—অতীব রহস্যজনক…(হাসে) আরে মেঘনাদ, ওই জন্যই ক্রিমিনাল, পুলিশ আর পলেটিক্যাল ম্যানরা সাংবাদিককে অত ভয় করে—তার ওপর তুমি হইলে গিয়া একে সাংবাদিক তায় গোয়েন্দা, তুমি পার না কি ? কালা বিড়ালের পাকস্থলি থিকা 'ইচা' মাছও……কি কইলা, 'ইচা' মাছ চেন না ? চিংড়ি চিন ত কুঁচা চিংড়ি……আবার কি কইলা তোমার বাজে বকবার এখন টাইম নাই, কেন, বলি ঘোড়ায় কি জিন পরাইয়া রাখছ……বেশ, বেশ, তাই হইব, আজই সন্ধ্যায় ফোর্স লইয়াই যামু……তবে দেখো শেষ পর্যন্ত না……আঁ ! তবে তো আর কথাই চলে না……ব্যাস, ব্যাস, ডি. সি. ডি. ডি.-কে আর জ্ঞান দিতে লাগব না……হ, রাখ…… !

রিসিভার রেখেই কলিং বেল বাজালেন মিঃ গড়গড়ি।

একজন কনস্টেবল এসে স্যালুট করলো।

—ইন্সপেকটর পাণ্ডে কো বুলাও, জলদি।

—জী সরকার, স্যালুট করে হুড়মুড়িয়ে বেরিয়ে যায় সে।

—শ্রীশ্রীবোলতাবাবা, এইবার দেখুম কার মাহাত্ম্য বেশী, ভক্তের না পুলিশের, আপন মনেই বিড় বিড় করে উঠলেন মিঃ প্রাণেশ গড়গড়ি।

॥ নয় ॥

('বোলতা উইড়া গ্যাসে')

বোলতা আশ্রম কক্ষে ভক্তদের ভিড়টা আজ যেন বড় বেশি বেড়েছে।

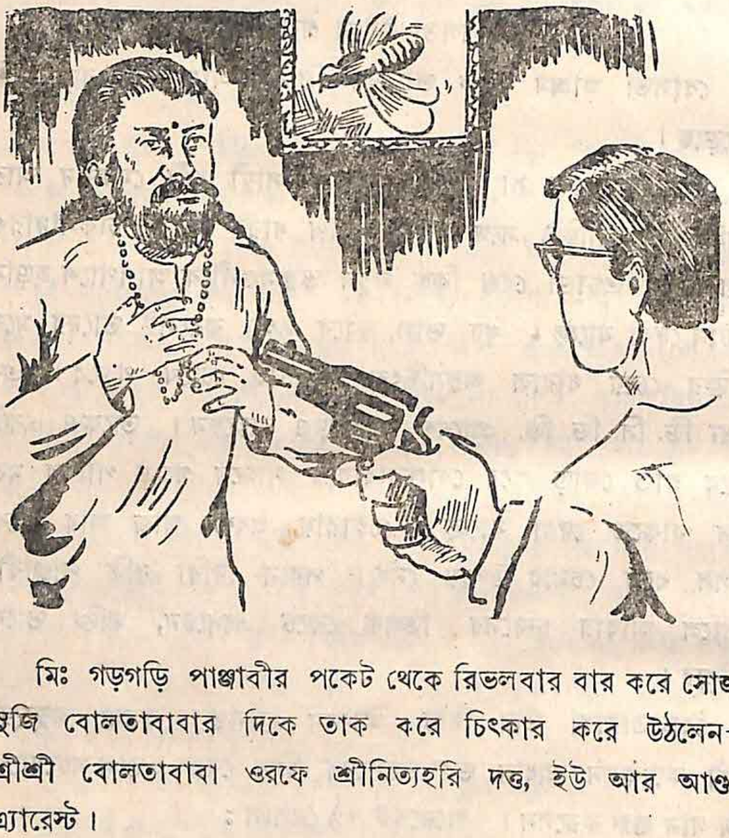
ভক্তদের মধ্যে সাংহাই-এর ছুই ব্যবসায়ী রূপী মেঘনাদ আর আমি তো আছিই, সঙ্গে হনুমান টুপি ধারী নিতাই চাকলাদারও রয়েছেন। এছাড়া বেশ কিছু নতুন ভক্তমণ্ডলীকে আশপাশে ছড়ান ছিটান দেখা যাচ্ছে। খুব ভাল ভাবে লক্ষ্য করলেই তাদের মুখে ভক্তির চেয়ে ধারাল অনুসন্ধিৎসু ভাবটাই চোখে পড়বে। এর মধ্যে ডি. সি. ডি. ডি. প্রাণেশ গড়গড়িও রয়েছেন। তাঁকেও একই ভাবে হাত জোড় করে বোলতাবাবার সামনে গরুড় পাখির মত বসে থাকতে দেখা যাচ্ছে। চেহারায় অবশ্য আজ আর ওঁকে পুলিস বলে চেনার উপায় নেই। পরনে দিব্যি ধুতি পাঞ্জাবী, কপালে আবার চন্দনের তিলক কেটে এসেছেন, ভক্তি ভাবে টইটম্বুর।

বোলতাবাবা তাঁর দিব্য আসনে ধ্যানস্থ। বড়মা অনুসূয়া দেবী কয়েকজন প্রধান ভক্ত-ভক্তাদের নিয়ে খোল-কত্তাল সহযোগে নাম গান শুরু করলেন। অনেকেই কণ্ঠ মেলাল :

"বোলতাবাবার কথা অমৃত সমান
মন দিয়া শোনে যে হয় পুণ্যবান।
বোলতেশ্বরী সাধক বোলতাবাবা হে
মুক্ত কর জীবকুল—এই কলিকালে।

অপার মহিমা—তুমি বোলতা অবতার
মর্ত মাঝে আইলা হে, লীলা বোঝা ভার ॥”

নাম গান তখনও শেষ হয় নি—হঠাৎ বাইরে থেকে তীক্ষ্ণ পুলিসী বাঁশি বেজে উঠলো। সঙ্গে সঙ্গে বদলে গেল ঘরের পরিস্থিতি।



মিঃ গড়গড়ি পাঞ্জাবীর পকেট থেকে রিভলবার বার করে সোজাসুজি বোলতাবাবার দিকে তাক করে চিৎকার করে উঠলেন—শ্রীশ্রী বোলতাবাবা ওরফে শ্রীনিত্যহরি দত্ত, ইউ আর আণ্ডার এ্যারেস্ট।

কয়েক সেকেণ্ডের জন্য এক বিস্মিত নৈঃশব্দ নেমে এল ঘরের মধ্যে তারপরই ভক্তদের মধ্যে ভীতিচাঞ্চল্য, হুড়োহুড়ি পড়ে গেল। কিন্তু ততক্ষণে এতক্ষণ ভক্ত সেজে থাকা সাদা পোশাকের পুলিসের দল ঘিরে ফেলেছে সমস্ত ঘরটা।

—কেউ ঘর থেকে পালাবার চেষ্টা করবেন না, যে যেখানে আছেন চুপচাপ বসে থাকুন। মিঃ গড়গড়ির এক সাগরেদ ধমক দিলেন।

বোলতাবাবাও বোধ করি হতচকিত, বাকরুদ্ধ।

মেঘনাদ চেঁচিয়ে উঠলো—অর্ণব, শিগগির বোলতাবাবার বাঁ পাশের লাল কমণ্ডলুর জলটা বোলতা-আক্রান্ত ভক্তদের গায়ে ছিটিয়ে দে—ওঁরা এক্ষুণি বোলতা মুক্ত হয়ে যাবেন।

এ কি বলছে মেঘনাদ। কমণ্ডলুর জল ছেটালেই বোলতা-আক্রান্ত ভক্ত বোলতা মুক্ত হয়ে যাবে।

কিন্তু মেঘনাদ আমায় ভাববার অবকাশ দিল না, আবার চেঁচিয়ে উঠলো—আঃ, অর্ণব, দেরী করিস নি।

কথাটা শুনে নিতাই চাকলাদারই আগে এগিয়ে এসেছেন। হাঁফাতে হাঁফাতে বললেন—কাজটা আমাকে দিয়েই শুরু করুন মশাই; গত এক হপ্তায় বোলতার কামড়ে তো মুখের জিওগ্রাফি বদলে গেছে।

কিন্তু আমি কমণ্ডলুর কাছে এগুতেই বোলতাবাবা এবার হুঙ্কার দিয়ে উঠলেন—দাঁড়াও, এগিও না। আগে আমার বিরুদ্ধে কি অভিযোগ জানতে চাই।

শুনেই ভড়কে গেলাম। মিঃ গড়গড়ি কি বলতে যাচ্ছিলেন, তার আগেই মেঘনাদ বললো—আমি বলছি। বোলতাবাবা ওরফে নিত্যহরি দত্ত, আপনার বিরুদ্ধে প্রথম অভিযোগ, আপনি প্রখ্যাত গন্ধ বিজ্ঞানী ডঃ অলকেশ সেনকে এই আশ্রমের এক গোপন ঘরে বন্দী করে রেখেছেন, দ্বিতীয় অভিযোগ স্ব-ঘোষিত মহাপুরুষ ছদ্মবেশে আশ্রমের আড়ালে অর্থ উপার্জনের নানা অসৎ উপায় অবলম্বন করেছেন এবং তৃতীয় অভিযোগ, মানুষের কাছে টাকা আদায়ের জন্য বিষাক্ত বোলতা লেলিয়ে তার জীবন অতিষ্ট করার আজব উপায়ে আপন স্বার্থসিদ্ধি করে চলেছেন।

বোলতাবাবা চিৎকার করে উঠলেন—সব মিথ্যা। মূর্খ, নাস্তিক তোমরা।

—সেডা আদালতেই প্রমাণ হইব শ্রীশ্রীবোলতাবাবা, ডি. সি. ডি. ডি. প্রাণেশ গড়গড়ি বললেন।

ইতিমধ্যে আমি লাল কমণ্ডলুর জল নিতাই চাকলাদার এবং অন্যান্য বোলতা-আক্রান্ত ভক্তদের গায়ে ছিটিয়ে দিয়েছি এবং আশ্চর্য ব্যাপার—বোলতাগুলো ভন ভন করে উড়ে পালিয়েছে। কই, আর তো ওদের কাছে ঘেঁসতে দেখছি না।

মেঘনাদ কমণ্ডলুর বাকি জলটা সারা ঘরেই ছিটতে শুরু করলো—এবং একই আশ্চর্য কাণ্ড দেখলাম। বোলতার ঝাঁক এবার ঘর ছেড়ে উড়ে পালাতে শুরু করেছে।

শ্রীশ্রীবোলতাবাবা এবং তাঁর প্রধান চ্যালারা তখন রাগে দাঁতে দাঁত ঘসতে শুরু করেছে—কিন্তু আইনের রক্ষক পুলিসবাহিনীর সামনে তাদের কিছু করার উপায় ছিল না।

চোখের ওপর ঘটে যাওয়া এই সব ব্যাপারগুলো আমার কাছে সত্যিই বড় অদ্ভুত মনে হচ্ছিল। কি আছে ওই লাল কমণ্ডলুর জলে, যা ছিটিয়ে দিলেই বোলতারা পালিয়ে যায়। সত্যিই কি কোন মন্ত্রের গুণ ?

ইতিমধ্যে একজন পুলিস অফিসারকে দেখা গেল আশ্রম কক্ষের দরজায়। ওঁর সঙ্গে একজন অজানা লোক, বয়সে বৃদ্ধ। এক মাথা সাদা উস্কোখুস্কো চুল, চোখে হাই পাওয়ারের চশমা। ভদ্রলোককে কেমন রুগ্ন আর কাহিল মনে হচ্ছে।

প্রাণেশ গড়গড়ির সেদিকে চোখ পড়তেই তিনি লাফিয়ে উঠলেন, —ইনসপেক্টর পাণ্ডে, ইনিই নিশ্চয় ডঃ অলকেশ সেন ?

ইনসপেক্টর পাণ্ডে স্যালুট করে বললেন,—হাঁ স্যার, সারা আশ্রম তল্লাশী চালিয়ে একটা ঘরে বন্দী অবস্থায় ওনাকে পেয়েছি।

—তবে তো আমাগো প্রথম অভিযোগ এখানেই প্রমাণিত হইল।

মেঘনাদ এবার মিঃ গড়গড়ির দিকে তাকাল। বললো—মিঃ

গড়গড়ি, ডঃ সেনকে খুবই অসুস্থ মনে হচ্ছে। অনুমান করতে পারছি এই কদিন ওঁর দেহ মনের ওপর খুবই চাপ পড়েছে। আপনি যদি আপত্তি না করেন আমি বরং মিঃ সেনকে নিয়ে যাবার ব্যবস্থা করি। আপনি বোলতাবাবাকে পুলিস ভ্যানে তোলার ব্যবস্থা করুন। অর্ণব রইল আপনার সঙ্গে।

মিঃ গড়গড়ি আর আপত্তি করেন না। মেঘনাদের পিছু পিছু নিতাই চাকলাদারও ঘর ছেড়ে চলে যান। ততক্ষণে উনি ওনার হনুমান টুপি দস্তানা আর ওভারকোট খুলে ফেলেছেন। একটা বোলতাও আর ওঁকে কামড়ায় নি—এটা আবশ্যই বোলতাবাবার ওই রহস্যময় লাল কমণ্ডলুর তরলের গুণে।

ওরা চলে যাবার পর মিঃ গড়গড়ি সকৌতুকে বোলতাবাবার দিকে তাকিয়ে বললেন—নিত্যহরিবাবু, থুড়ি শ্রীশ্রীবোলতাবাবা, আপনিও চলেন। ভ্যান, থুড়ি রথ খাড়াইয়া আছে।

বোলতাবাবা রাগে গরগর করতে করতে বললেন,—এর উপযুক্ত প্রতিফল তোমরা পাবে,—দেবী বোলতেশ্বরী······

—উইড়া গ্যাসে······দ্যাখলেন না, কমণ্ডলুর জলের ছিটায় সব বোলতা কেমন ভন ভন কইরা উইড়া গেল—সেই লগে দেবী বোলতেশ্বরীর······বলতে বলতে মিঃ গড়গড়ি হেসে উঠলেন। এমন মজার কেস বোধ হয় জীবনে উনি পাননি। এরপর অনুসূয়া দেবীর দিকে ফিরে বললেন—মা জননী, আপনারেও যে যাইতে হইব।

—ধ্বংস হবে। ইউ উইল বী রুইন্ড······

বোলতাবাবার হুঙ্কার শেষ হল না, তার আগেই হাসিতে ফুটিফাটা হলেন ডি. সি. ডি. ডি. প্রাণেশ গড়গড়ি। হাসতে হাসতেই চোখ নাচিয়ে বললেন—তবে যে শুনেছিলাম বাবা বৈদিক ভাষা ছাড়া কথা কন না। বলতে বলতেই যেন ম্যাজিকের মত হাতকড়িটা বার করে বোলতাবাবার হাতে পরিয়ে দিলেন।

আশ্রমের বাইরে তখন হাজার কৌতূহলী জনতার জটলা।

॥ দশ ॥

(বিশ্লেষণ ও প্রমোশন)

মেঘনাদের দুর্গাচরণ মিত্তির লেনের বাড়ির বৈঠকখানাতেই আসর বসেছিল। বক্তা প্রধানতঃ মেঘনাদ আর শ্রোতা আমরা তিনজন—ডি. সি. ডি. ডি. মিঃ প্রাণেশ গড়গড়ি, নিতাই চাকলাদার আর আমি।

আজ সকালের প্রতিটি দৈনিক সংবাদপত্রেই বোলতাবাবার পুরো ব্যাপারটা সবিস্তারে বেরিয়েছে; সেই সঙ্গে রহস্যভেদী মেঘনাদ ভরদ্বাজের প্রশংসা—স্বভাবতঃই মেঘনাদের মনটা আজ খুশি খুশি।

মেঘনাদ বলছিল—ব্যাপারটা আর কিছু নয়, ক্রোম্যাটোগ্রাফ বা গন্ধ বিজ্ঞানের ভেলকি। বোলতাবাবা ওরফে নিত্যহরি দত্ত সেটাকেই দারুণ ভাবে কাজে লাগিয়েছে।

আমি বললাম—এভাবে আচমকা শুরু না করে তুই বরং বিষয়টা গোড়া থেকে খুলে বল।

মেঘনাদ একটু হেসে বললো, বেশ, তাই বলছি। নিত্যহরি দত্তের পুরনো ইতিহাস আমি যা পেয়েছি—অপরাধী জগতের সে এক পুরনো পাপী।

—কও বাস্তু ঘুঘু। মিঃ গড়গড়ি কথার সূত্র টেনে বললেন—নিত্যহরি আর তার স্ত্রী কমলা ওরফে অনুসূয়া দেবী ওরফে বড়মা অতীতে নানা সময়ে মানুষেরে প্রতারণা কইরা নিজেদের কাম হাসিল করসে এবং এমন কৌশলে যে বেশির ভাগ সময়ই তাদের কড়ে আঙুলটিও কেউ ছুঁইতে পারে নাই।

—হ্যাঁ। এবার কিন্তু ওরা স্বামী-স্ত্রী এক অভিনব পরিকল্পনা

গ্রহণ করেছিল। সাধারণ ধর্মবিশ্বাসী সরল মানুষকে ছলনা এবং বিভ্রান্ত করে বেশ কিছু টাকা উপার্জনের সেই নয়া কায়দা আর কৌশলের কথা তো আপনারা ইতিমধ্যেই জেনে ফেলেছেন।

—কিন্তু যেটা বুঝতে পারছি না মশাই তা হল প্রণামীর টাকা দিতে অনিচ্ছুক লোককে বোলতা লেলিয়ে দেবার রহস্যটা। নিতাই চাকলাদারের এ প্রশ্নে আমিও উৎকর্ণ হলাম।

—এবার সে কথায় আসছি। মেঘনাদ ধীরে সুস্থে একটা সিগারেট ধরিয়ে বললো—ব্যাপারটা প্রথমে আমাকেও বেশ ধোঁকায় ফেলেছিল। কিন্তু সেটা পরিষ্কার হল প্রখ্যাত গন্ধ-বিজ্ঞানী ডঃ অলকেশ সেনের নিরুদ্দেশ হবার সংবাদটা কাগজে দেখে তারপর তাঁর ল্যাবরেটরি এ্যাসিসটেণ্ট চন্দন সোমের সঙ্গে আলোচনা করে।

ডঃ সেন কি বোলতাদের আকৃষ্ট করার মতো কোন গন্ধ আবিষ্কার করেছিলেন? আমার এতক্ষণের অনুমানটা এবার প্রকাশ করে ফেলি।

—এক্সজ্যাক্টলি! মেঘনাদ যেন আমার কথাটাই লুফে নিয়ে ছুঁড়ে দিল: ডঃ সেন গন্ধকে রাসায়নিক অণুতে বিশ্লেষণ করতে এবং কৃত্রিম ভাবে যে কোন গন্ধ তৈরী করতে সক্ষম হয়েছিলেন।

নিতাই চাকলাদার মাথা নেড়ে বললেন—ব্যাপারটা ঠিক বোধগম্য হল না মশাই। খামকা কৃত্রিম গন্ধ তৈরী করে লাভ কি?

– একটা লাভ তো চোখের সামনেই দেখতে পেলেন। মেঘনাদ নিতাই চাকলাদারের দিকে তাকিয়ে কিছুক্ষণ মিটমিট করে হাসল, তারপর সিগারেটের ছাইটা এ্যাসট্রেতে ঝেড়ে নিয়ে বললো, আচ্ছা, বিষয়টা খুব সহজ করে সংক্ষেপে বিশ্লেষণ করি।

মেঘনাদ শুরু করলো: জীব জগতে গন্ধের প্রভাব এককথায় অপরিসীম। গন্ধ যেমন মানুষকে রসনার স্বাদ দেয় কিংবা কোন কোন পুরনো স্মৃতিকে জাগিয়ে তোলে, তেমনি কৃত্রিম গন্ধ সৃষ্টি দ্বারা

আকর্ষণ বা বিতাড়ন করা যেতে পারে কোন বিশেষ জাতীয় প্রাণী কিংবা পতঙ্গকে কোন বিশেষ উদ্দেশ্যে।

একটু থেমে মেঘনাদ উদাহরণের সাহায্যে ব্যাপারটা পরিষ্কার করেঃ গন্ধের উপযোগিতা কাজে লাগিয়ে একটা ভরন্ত শষ্যক্ষেত্রে যদি কৃত্রিমভাবে বেড়ালের গন্ধ ছড়িয়ে দেয়া যায় তবে শষ্যের সব থেকে বড় শত্রু ইঁদুর তাড়ান সহজ হতে পারে, আবার ধ্বংসের কাজে লাগিয়ে পঙ্গপাল ডেকে এনে ক্ষেতের সব ফসল তছনছও করে দেয়া অসম্ভব কিছু নয়।

এতক্ষণে সব ব্যাপারটা সহজ হল আমার কাছে। বললাম, নিশ্চয়ই এক্ষেত্রে বোলতার ঝাঁককে আকৃষ্ট করার মতো উপযুক্ত গন্ধ দরকার মতো লোকের গায়ে স্প্রে করে দেয়া হত?

—হ্যাঁ। মেঘনাদ ঘাড় নাড়ে—এ ব্যাপারে আশ্রম সেবক হাবলাচরণই ছিল বাবার মূল সাকরেদ। মিঃ চাকলাদারের মতো আরও কয়েকজন অবাধ্য ভক্তের শরীরে সে পথে ঘাটে কোন সুবিধেজনক স্থানে স্প্রে করে দিত।

তাজ্জব কাণ্ড। মেঘনাদের বাড়ির সামনে হাবলাচরণের দাড়ি গোঁফ লাগিয়ে ঘোরাঘুরি করার রহস্যটাও এবার পরিষ্কার হল।

কিন্তু এ ফর্মুলা বিজ্ঞানী অলকেশ সেনের কাছ থেকে বোলতাবাবার কাছে গেল কি করে? উনি কি লোভে পড়ে টাকার বিনিময়ে বোলতাবাবার কাছে ফর্মুলা বিক্রি করেছেন?

—না। মেঘনাদ আমার সংশয়ের জবাব দিল। বিক্রি করলে ডঃ সেনকে নিশ্চয়ই শ্রীশ্রীবোলতাবাবা তাঁর আশ্রমের গোপন কক্ষে বন্দী করে রাখতেন না। বোলতাবাবা কোন ভাবে ডঃ সেনের ল্যাবরেটরি থেকে তা পাচার করে এনেছিলেন।

—অর্থাৎ, চুরি করে?

—হ্যাঁ, সম্ভবতঃ তাই। আর সেটা জানতে পেরেই ডঃ অলকেশ সেন যখন নিত্যহরি দত্ত ওরফে বোলতাবাবার কাছে প্রতিবাদ

জানাতে গিয়েছিলেন, তখনই আর কোন উপায় না দেখে বোলতাবাবা তাঁকে নিজের আশ্রমে বন্দী করে রাখেন।

শুনতে শুনতে ডি. সি. ডি. ডি. প্রাণেশ গড়গড়ি মুগ্ধ বিস্ময়ে উঠে দাঁড়ান, এগিয়ে এসে মেঘনাদের হাত দুটো ধরে বললেন—মেঘনাদ, তুমি তো পাকা গোয়েন্দারেও হার মানাইলা। সাধে কি আর কইতাছিলাম সাংবাদিকরা পারে না কি, কালা বিড়ালের পাকস্থলির চিংড়ি মাছও—

কিন্তু এবারেও তিনি তাঁর এ কথাটা শেষ করতে পারলেন না। তার আগেই ফোনটা বেজে উঠলো।

মেঘনাদ রিসিভার ধরলো।

—হ্যালো···হ্যাঁ, মেঘনাদ বলছি। কে হরিসাধনবাবু? নমস্কার স্যার···এ্যা, কি বললেন—ধন্যবাদ—অসংখ্য ধন্যবাদ, হ্যাঁ সবটাই নোট করা আছে···হ্যাঁ, 'তাজা খবর'-এর পরের সংখ্যাতেই এটা একটা দারুণ লেখা হয়ে বেরুবে···হ্যাঁ, কালই যাচ্ছি···আচ্ছা।

মেঘনাদ রিসিভার রাখতেই মিঃ গড়গড়ি বললেন তোমার 'তাজা খবর'-এর মালিক দারুণ খুশি মনে হইতাসে?

—হ্যাঁ। একটা আড়মোড়া ভেঙে শরীরটা সোফায় এলিয়ে দিয়ে মেঘনাদ বললো—ওনার এক খুশিতেই এ্যাসিসটেন্ট রিপোর্টার থেকে আমার 'সাব এডিটর'-এর প্রমোসন।

এবার শুধু মিঃ গড়গড়ি নয় আমরা সবাই খুশিতে হৈ চৈ করে উঠলাম। নিতাই চাকলাদার উঠে দাঁড়িয়ে বললেন—আমি মশাই শুধু কথায় চিড়ে ভেজাতে রাজী নই, আজ রাতে মেঘনাদবাবুর অনারে আমার ফ্ল্যাটে আপনাদের তিনজনেরই নেমন্তন্ন রইলো। বলেই মেঘনাদের দিকে তাকিয়ে নিতাই চাকলাদার বললেন—এ ব্যাপারে আপনার কোন বক্তব্য আছে মেঘনাদবাবু?

—বক্তব্য আমার একটাই, মেঘনাদ বললো।

—বলে ফেলুন।

—আজকের মেনুতে গড়গড়িদার জন্যে একটা স্পেশাল আইটেম যেন অবশ্যই রাখা হয়।

—স্পেশাল আইটেম! নিতাই চাকলাদার বেশ ভাবনায় পড়েছেন মনে হলো।

মেঘনাদ নিতাই চাকলাদারের মনের অবস্থাটা যেন অনুভব করেই মুখটা আরও গম্ভীর করে বললো,—ইচা মাছ অর্থাৎ চিংড়ি মাছের মালাইকারী।

আমরা সবাই হেসে উঠলাম। তবে সকলের হাসি ছাপিয়ে শোনা গেল ডি. সি. ডি. ডি. মিঃ প্রাণেশ গড়গড়ির অনাবিল অট্টহাসি। হাসতে হাসতেই বললেন,—ড্যাফিনিটলি।

—শেষ—